রাজা রামমোহন

মণি বাগচী

রাজা রামমোহন

মণি বাগচি

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ

৮।১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

প্রকাশক
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাম : ছয় টাকা মাত্র।

মুদ্রক
শ্রীগৌরচন্দ্র জানা
জয় তারা প্রেস
৩১/সি, গোরাচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

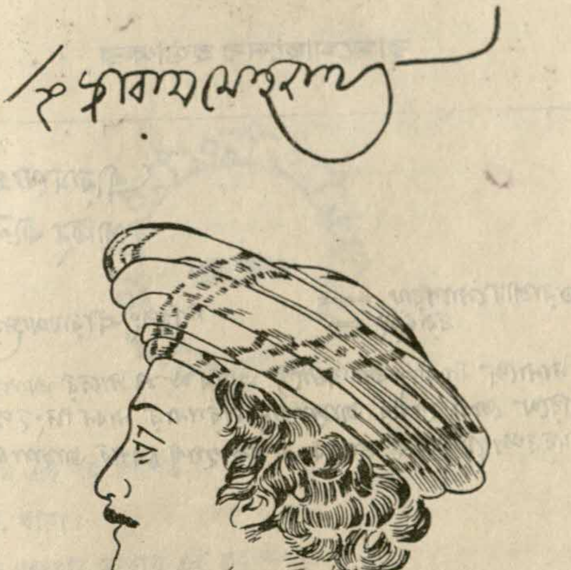
ইতিহাসের উদয়াচলে ভাস্বর সূর্য রামমোহন।
ইতিহাসের পটে এক আশ্চর্য প্রকাশ তিনি। তিনিই তো আমাদের দেশে নবজাগরণের প্রথম আলোকদূত। নব ভারতের জীবন-চেতনার বাণী তাঁরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছিল প্রথম। আবার তাঁরই কণ্ঠে আমরা শুনেছি বিশ্ববোধের উদার বাণী।
রামমোহনই জাতির প্রকৃত জনক।
নবভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের ভগীরথ তিনি।
যেমন বিরাট ছিলেন দেখতে, তেমনি বিশাল ছিল তাঁর হৃদয়। তার চেয়েও বিশাল ছিল তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধি। ভারতকে মহা-ভারত করবার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। দেশ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা যখন ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীতকে, নানারকম কুসংস্কারের জঞ্জালে দেশ যখন ভরে গিয়েছিল, তখনই এসেছিলেন যুগসারথি রামমোহন। জীবনের সারাটি পথে তাঁর সকল চিন্তার বড়ো চিন্তা ছিল ভারতবর্ষের কল্যাণ, ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ।
এই যুগপুরুষকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না।

মণি বাগচি
৯০, বাগুইহাটি রোড
কলিকাতা-২৮

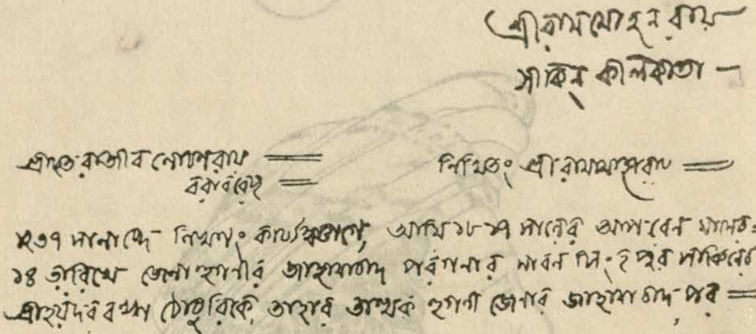
রামমোহন

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা রহিয়াছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি—'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে। তোমাকে বঙ্গদেশে বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাকপটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা লঘু প্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্র গৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরে প্রখর আলোকে অন্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলকের সাহায্যে ভাল মন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল, তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রামমোহনের হস্তাক্ষর



শ্রীরামমোহন রায়

সাকিন কলিকাতা

লিখিতং শ্রীরামমোহন রায়

এক

—তুমি এই বই লিখেছ ?

—হ্যাঁ, বাবা।

—কে তোমার মাথায় এই দুর্বুদ্ধি দিলো ?

—দুর্বুদ্ধি ? কি বলছেন বাবা ?

—তা নয়তো কি ? হিন্দুর ছেলে তুমি, বৈষ্ণব বংশের পুত্র তুমি, তুমি কিনা লিখলে এই বই ? এতো আমি ভাবতেও পারিনে যে আমার ছেলে হয়ে, রায় বংশের সন্তান হয়ে তুমি আমাদের ধর্ম প্রণালীর বিরুদ্ধে বই লিখবে ?

—আপনি কি আমার বইটা পড়েছেন, বাবা ?

—পড়েছি বৈকি। এ গাঁয়ের মাথা যাঁরা তাঁদেরও কেউ কেউ পড়েছেন। সবাই এসে আমাকে শাসিয়ে গেলেন—

—শাসিয়ে গেলেন ? কি শাসিয়ে গেলেন, বাবা ? পুতুল পূজোটা সত্যিই ধর্ম নয়, এই কথাটাই আমি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছি।

—ষোল বছরের ছেলে তুমি, শাস্ত্রের মর্ম কতটুকু বোঝো ?

—যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে আপনাদের পুতুল পুজোর মধ্যে ধর্ম নেই।

—কি! আমাদের দেব-দেবীর বিগ্রহকে তুমি পুতুল বলতে চাও, এত বড় দুঃসাহস!

—বাবা, শাস্ত্র বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ—

—শোনো' আমার বাড়িতে বিধর্মীর স্থান নেই। তোমাকে ত্যাগ করতে পারি, পারি নে সমাজকে ত্যাগ করতে।

ছেলে ও বাবার মধ্যে যখন এই রকম কথা কাটা-কাটি হচ্ছিল তখন অন্দর মহল থেকে ছেলের মা ছুটে এসে বললেন—আমি মনে করব আমার ছেলে মরে গেছে, তবু তোমার মতো কুপুত্রকে নিয়ে ঘর করতে পারব না।

বাবা ও ছেলের মধ্যে বিচ্ছেদ হলো।

ছেলে ও মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হলো।

ষোল বছরের ছেলে, বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

এই ছেলেটি কে জানো? ইনিই রাজা রামমোহন রায়।

রাধানগর। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার একটি গ্রাম।

বাংলার এই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামমোহন। পলাশীর যুদ্ধের সতেরো বছর পরে, ২২মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা—রামকান্ত রায় ও মা—তারিণী দেবী। পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন তিনি। রায় পরিবারের কথা বলার আগে, রামমোহনের জন্মকালে এদেশের সমাজের অবস্থাটা কি রকম ছিল সেটা তোমাদের জানা দরকার। তোমরা যখনই কোন যুগপুরুষের জীবন কথা পড়বে তখন তিনি যে বংশে জন্মেছেন সেই বংশের কথা যেমন জানবে, এবং তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ের ইতিহাসটাও একটু জেনে নেবে

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাংলার ইতিহাসে নতুন পালা শুরু। সেই যুদ্ধের পর অস্ত গেল বাংলার স্বাধীনতা। পলাশীর প্রান্তরে উড়ল নবাগত এক রাজশক্তির বিজয় নিশানা নবাবী আমল শেষ হয়ে শুরু হয় কোম্পানী আমল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইংরেজ হলো বাংলার নতুন নবাব—সর্বেসর্বা। আর পুরানো দিনের নবাব মীরজাফর হলেন কোম্পানীর হাতের পুতুল। বাণিজ্য করতে এদেশে যারা একদিন এসেছিল তারাই আজ বাংলার মসনদে বসল। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।'

দিল্লীর মসনদে যখন মুঘল সম্রাট তখন থেকে ধীরে ধীরে য়ুরোপ থেকে এ দেশে বাণিজ্য করতে অনেকেই এসেছিল—ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ডাচ ও পর্তুগীজ। তারপর এদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে ইংরেজ। পলাশীর যুদ্ধে তাদের জয়লাভ, ভারত-ইতিহাসের একটা ঘটনা। এরপর পৌনে দু'শবছর ইংরেজ শাসন এদেশে কায়েম হয়েছিল।

১৭৬৫ সাল।

মীরজাফর মারা গেলেন। ঐ বছরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পেল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ। কিন্তু কোম্পানী তখনই সরাসরি শাসনদণ্ড গ্রহণ করল না, পাছে দেশের লোকের কাছে তাদের আসল অভিসন্ধিটা ধরা পড়ে যায়। তাই রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ল মহম্মদ রেজা খাঁয়ের ওপর। ইংরেজের একান্ত অনুগত রেজা খাঁ নতুন মনিবের মন রাখবার জন্য নির্মম ভাবে রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। এর ফলে উৎপীড়ন আর অত্যাচারের স্রোত বয়ে গেল সারা দেশে। চারদিকে নামল বিভীষিকার করাল ছায়া। দেবীসিংহের অত্যাচার আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে।

তারপর ১৭৭০ সালে দেখা দিল সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ—ইতিহাসে যার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সমস্ত দেশটাই একরকম জনশূন্য হয়ে যায় —পরিণত হয় একটা বিরাট শ্মশানে। এই সময়ের মধ্যে বেনিয়া

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের সমস্ত বাণিজ্যও ধ্বংস করে দিয়েছিল নিজেদের স্বার্থে। এইভাবে সুকৌশলে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত দেশটাকে একটু একটু করে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে নিজেদের ব্যবসারও প্রসার করেছে। ইংরেজ শুধু দেশীয় বাণিজ্য ধ্বংস করেনি, নবাবের সাহায্যে ডাচ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজদের ব্যবসাও ধ্বংস করেছে।

১৭৭২ সাল।

দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল। ঘোষিত হলো কোম্পানীর অধিকার। শুরু হলো নতুন যুগ। বাংলার নবাবী আমলের শেষ হলো। কোম্পানী এখন বাংলার একচ্ছত্র শাসনকর্তা। দেশের জনসাধারণ হলো কোম্পানীর অধীন। প্রজার জীবনধারণ, জমিদারের জমিদারী সব কিছু এখন থেকে নির্ভর করে রইল ইংরেজের অনুগ্রহের ওপর। কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হলো এইদেশে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজপাট বসল নতুন শহর কলকাতায়। এতদিন কোম্পানী শুধু শোষণ করে এসেছে। এখন থেকে তাকে শাসন করতে হবে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস হলেন প্রথম গভর্ণর জেনারেল।

সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলো ১৭৭৪ সালে। এর ঠিক ছাব্বিশ বছর বাদে, ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আবার এদিকে বাইবেল হাতে গুটি গুটি এসে শ্রীরামপুরে বাসা বাঁধলেন খ্রীষ্টান পাদ্রীরা। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হলো তাঁদের ব্রত। কোম্পানী করে শাসন আর পাদ্রীরা করে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার। এর পরোক্ষ ফলটা কিন্তু বাংলার পক্ষে ভালই হয়েছিল—কল্যাণের বীজ উপ্ত হয়েছিল বাংলার মাটিতে। শিক্ষা, জ্ঞান, মনুষ্যত্বকে সঙ্গে নিয়ে এদেশে এলেন অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে। এদেশের রুদ্ধ জানালার অর্গল গেল খুলে।

পশ্চিমের আলো-বাতাসে সিক্ত হয়ে ওঠে বাঙালীর মন—প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তার লুপ্তপ্রায় চেতনা। পশ্চিম জগতে তখন জীবনের সবুজ সূচনা। তার সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য মানুষের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত। এই সাধনার ঢেউ এসে আঘাত করলো বঙ্গোপসাগরের কূলে। পশ্চিমের শিক্ষা, জ্ঞান এবং মানবহিত সাধনার আলোকে বাংলা দেশের যে মানুষটির চিত্ত নতুন দীপ্তিতে প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তিনিই হলেন রামমোহন।

রামমোহনের জন্মকালে হিন্দুসমাজের অবস্থাটা কি রকম ছিল? কোম্পানীর শাসন কায়েম যখন হলো তখন ধাপে ধাপে বাঙালী জীবন এগিয়ে গেছে অধঃপতন আর অবক্ষয়ের পথে। তার জীবনের সারা গায়েই নিদারুণ বিকৃতি। তখন সমাজের চারিদিকে জমে উঠেছে জড়তা আর অন্ধ কুসংস্কারের জঞ্জাল। কোথাও আলো নেই—শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। চারিদিকে অজ্ঞানতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের রাজত্ব। শাস্ত্র নয়, উপশাস্ত্রেরই প্রাধান্য। লোকের মন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আগুন। চারিদিকে বিরাজ করছিল যেন এক দুঃসহ কালরাত্রি। সব মিলিয়ে সমস্ত জাতির জীবন জুড়ে শুধু ঘন কালো অন্ধকারের জমাট বিভীষিকা।

সমাজের অবস্থা আরো শোচনীয়। গঙ্গাসাগরে ছেলে ভাসিয়ে দেওয়া, মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ—এইভাবে নানারকম কুসংস্কারের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সমাজ যেন শতাব্দীর অন্তিম পর্বে এসে নিজের চিতাশয্যা রচনা করল। পুতুল পূজোর আড়ম্বরটাই ছিল বেশী, আসল ধর্মের প্রতি কারো ছিল না এতটুকু আগ্রহ। ধর্ম তখন ভাতের হাঁড়িতে। ব্রাহ্মণরা হয়ে উঠছেন বিষয়ী। সত্যিকার ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা তখন দেশের কোথাও ছিল না—ছিল শুধু ধর্মের আড়ম্বর ধর্মের ভড়ং। সেই ঘোর অন্ধকারের কালে আলোকের দূত হয়ে এসেছিলেন রামমোহন। নতুন যুগের নতুন মানুষ রামমোহন।

দুই

রাধানগরের কথা একটু বলতে হয়।

অনেক সাধক ভক্ত ও পণ্ডিতের জন্মস্থান এই রাধানগর। সংস্কৃত চর্চার জন্য এই গ্রাম এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এখানে শত শত টোল ছিল। রাধানগর আবার বৈষ্ণবের তীর্থ। এখানকার কয়েকটি মন্দিরের কারুকার্য খুবই সুন্দর। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ভক্ত অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের মন্দিরের স্থাপত্য খুব বিখ্যাত। এত বড় মন্দির বাংলাদেশে খুব কমই আছে। ঘণ্টেশ্বর শিবের মন্দিরটিও প্রসিদ্ধ। ঘণ্টেশ্বর খুব জাগ্রত দেবতা বলে অনেকের বিশ্বাস। রাধাবল্লভের মন্দিরটিও কম প্রাচীন নয়। এর পোড়ামাটির সৌন্দর্য আজো সকলকে মুগ্ধ করে। রাধানগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যপদ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও রমণীয়।

এই রাধানগরে আজ থেকে দু'শ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যুগপুরুষ রামমোহন। রাধানগর তাই বাংলার নতুন তীর্থ। বাংলার এক কবি এই তীর্থকে বন্দনা করেছেন এইভাবে—

এই সেই রাধানগর শোভন!
এই সেই পূত ভূমি!

যার নাম শুনি বাঙালীর মন
হরষ সাগরে হয় নিমগন,
শত ঝঙ্কার হৃদয়ের তারে
তান উঠে প্রাণ চুমি,
কত শুভ সুখ স্মৃতি বিজড়িত
এই সেই পূতভূমি !

এই রাধানগরেই সমাজ ও ধর্মসংস্কারের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। রামমোহন এর মাটিতে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁকে বুকে ধরেই তো রাধানগর শুধু তীর্থ হয়ে ওঠেনি, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের গৌরবও লাভ করেছে।

এইবার রায় পরিবারের কথা।

রামমোহন নিজেই বলেছেন, তাঁর পুর্বপুরুষেরা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁদের পদবী ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। রামমোহনকে ঠাট্টা করে একসময় একটা ছড়া বাঁধা হয়েছিল। তার আরম্ভটা এইরকম—

সুরাইমেলের কুল
বাড়ি খানাকুল
ওঁ তৎসৎ বলে এক
বানিয়েছে ইস্কুল।

এর থেকে জানা যায়, রামমোহন ছিলেন সুরাইমেলের কুলীন। তাঁর ঠাকুরদার বাবা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান মুর্শিদাবাদের বেণীপুর গ্রাম[১] ত্যাগ করে হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি রাধানগর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি এই শান্ত গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ধর্মীয় পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে এইখানে পরমসুখে বাস করতে থাকেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণদের যজন-যাজনই ছিল কৌলিক বৃত্তি ;

১ মতান্তরে শাকসা গ্রাম।

রামমোহনের পূর্বপুরুষরাও এই বৃত্তির অনুসরণ করতেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম বিষয়-সম্পত্তির দিকে মুখ ফেরালেন—কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে বিষয়কর্মে অনুরক্ত হন!

সে যুগে নবাব সরকারে, বিশেষ করে তার রাজস্ববিভাগে চাকরি করাটাই ছিল বৈষয়িক উন্নতির রাজপথ। কুলপ্রথা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র সেই রাজপথে পদক্ষেপ করলেন—বৈষয়িক সুখের আশায় নবাব সরকারে চাকরি নিলেন। তাঁর ছিল যেমন প্রখর বুদ্ধি তেমনি কর্মনিষ্ঠা। তাই অল্পদিনের মধ্যেই নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি নবাবের কাছ থেকে পেলেন 'রায় রায়ান' উপাধি। এই উপাধি সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর পদবীতে স্থান করে নিল। তখন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়'।

নবাব সরকারে কৃষ্ণচন্দ্রের চাকরি নেওয়ার একটা কাহিনী আছে।

বর্ধমানের রাজা ছিলেন তখন কীর্তিচন্দ্র রায়। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে বর্ধমানের জমিদারী ইজারা নেন। তাঁর কাছ থেকে আবার কিছু অংশে ইজারা নেন খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী। এই অনন্তরাম ছিলেন যেমন তেজস্বী, তেমনি ছিল তাঁর দাপট। তিনি বর্ধমানের রাজার কাছে নিয়মিত কর পাঠাতেন না। অথচ নবাব-সরকারে খাজনা পাঠাবার দায়িত্ব ছিল বর্ধমানের রাজার ওপর। তাই তিনি নবাবের কাছে একজন উপযুক্ত কর্মচারী প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার উত্তরেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাব পাঠালেন কৃষ্ণনগরে। এখানে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের মূর্তি দেখে কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হন। তিনি নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। তাই চাকরির খাতিরে এলেও তিনি শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি রাধানগর গ্রামেই বসবাস শুরু করেন।

রায় পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা কৃষ্ণচন্দ্র থেকেই।

তিনিই এই পরিবারের জীবন ও জীবিকার ধারাকে নতুন পথে পরিচালিত করেন। সেই পথ ধরেই চলেছিলেন তাঁর তৃতীয় পুত্র ব্রজবিনোদ। দক্ষ কর্মচারী হিসাবে নবাব সরকারে পিতার ন্যায়

তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্তও নবাব সরকারে চাকরি করতেন। রায় পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি তাঁর সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া রামকান্ত নিজেও কোম্পানীর কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন বর্ধমানের মহারাণীর মোক্তার। বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ব্রজবিনোদকে নিষ্কর অনেকে ব্রহ্মোত্তরও প্রদান করেছিলেন। উত্তরকালে রামকান্ত নবাব সরকারের চাকরি ত্যাগ করে বর্ধমান রাজসরকারে চাকরি নিয়েছিলেন।

রামমোহনের ঠাকুরদারা সাত ভাই ছিলেন। তাঁদের সাত ভাই-এর সাতজন স্ত্রী। কথিত আছে, তাঁরা নিজের হাতে সুরকি ভেঙ্গে রায়বংশের উপাস্য দেবতা 'রাজরাজেশ্বরের' মন্দিরটি নির্মাণে সাহায্য করেন। মন্দিরটি আয়তনে ক্ষুদ্র। পুরস্ত্রীদের আন্তরিকতা ও ভগবদ্ভক্তি যে অপূর্ব ছিল—এর থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। রায় পরিবারের সকলেই এই রাজরাজেশ্বরের পূজক ও উপাসক ছিলেন। এর থেকেই তো রামমোহন একেশ্বরের পূজার সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে তাঁর দেবতা ছিলেন নিরাকার ও অরূপ। রায়বংশের এই রকম ধর্মপরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলেই না উত্তরকালে রামমোহন হতে পেরেছিলেন একজন ধর্মসংস্কারক।

ব্রজবিনোদের সাতটি ছেলে; রামকান্ত তাঁর পঞ্চম পুত্র। জমিদার হলেও তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। নিজেরা বৈষ্ণব হলেও শাক্তের মেয়ে বিয়ে করে তিনি এই গ্রামে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। রামকান্তের তিনটি স্ত্রী—সুভদ্রা, তারিণী ও রামমণি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণী দেবীই রামমোহনের জননী। তিনি শাক্তবংশের মেয়ে। অথচ রামকান্ত ছিলেন পরম বৈষ্ণব বংশের ছেলে। সে যুগে শাক্ত আর বৈষ্ণবদের মধ্যে বিয়ের চলন ছিল না বললেই হয়। তাঁর মৃত্যুকালে ব্রজবিনোদকে যখন গঙ্গাতীরে আনা হয় তখন শ্রীরামপুরের ছাতরা গ্রামের শ্যাম ভট্টাচার্য তাঁর কাছে উপস্থিত হন।

অন্তিমপথের যাত্রী ব্রজবিনোদকে তিনি বলেন, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমরা বৈষ্ণব নই, 'শাক্ত। তার ওপর ভঙ্গ কুলীন। তবু আপনার সাত ছেলের মধ্যে যে কোন একটিকে কন্যা সম্প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করি। অন্তিমকালে ব্রাহ্মণকে বিমুখ করলেন না ব্রজবিনোদ। সাতটি পুত্রই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু রাজী হলেন না কেউই। অবশেষে এগিয়ে এলেন রামকান্ত পিতার বাসনা পূর্ণ করতে। শ্যাম ভট্টাচার্যের মেয়ে তারিণীর সঙ্গে রামকান্তর বিয়ে হলো। শাক্তর মেয়ে এলেন বৈষ্ণবদের বাড়ীতে। রাধানগরের শান্ত হিন্দু সমাজে সেদিন এই বিয়েকে উপলক্ষ্য করে কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি। রামমোহনের জন্মের পর কতদিন গৃহবিগ্রহ গোপীনাথের সম্মুখে বসে হরিনামের মালা জপ করতে করতে রামকান্ত ভাবতেন, পিতৃসত্য রক্ষার জন্যই তিনি বৈষ্ণব বংশের ছেলে হয়েও শাক্তবংশের মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সেই সত্য রক্ষারই কি পুণ্যফল তাঁর এই দ্বিতীয় পুত্র? হয়ত তাই। আমরা দেখতে পাব যে, শুধু রামকান্তের বা রায় বংশের পুণ্যফল নয়, রামমোহন ছিলেন সমগ্র হিন্দুজাতিরই পুণ্যফল। বাঙালীরও পুণ্যফল।

রামকান্তের সময় থেকেই রাধানগরের রায়েরা জমিদার বলে খ্যাতি অর্জন করেন। রামকান্তের তিনটি স্ত্রীর মধ্যে দ্বিতীয়া তারিণী দেবীর গর্ভে তাঁর একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। মেয়েই বড়, তারপরের দুটি ছিল পুত্র—প্রথমটির নাম জগমোহন, দ্বিতীয় রামমোহন। রামকান্তের প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রাদেবীর কোনো ছেলে পুলে হয়নি, তৃতীয়া স্ত্রী রামমণির গর্ভে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার নাম রামলোচন। রায় পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী তারিণীদেবী। তাঁকে সবাই ডাকত 'ফুল ঠাকুরাণী' বলে। যেমন দেখতে সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন তিনি। তাঁর মায়ের রূপ আর সমস্ত গুণই রামমোহন পেয়েছিলেন।

রামকান্ত জমিদারী চালাতেন তারিণীদেবীর বুদ্ধি নিয়ে ; স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারী তিনিই দেখাশুনা করতেন। তখন কর্মচারীরা তাঁর বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হতো, অথচ তিনি সাধারণ শিক্ষিতা ছিলেন। শাক্তবংশের মেয়ে হলেও বিয়ের পর তিনি শ্বশুরবাড়ির ধর্মকে আপন করে নিয়েছিলেন। ঠাকুর-দেবতায় তাঁর খুব ভক্তি ছিল। তাঁর চরিত্র ও স্বভাবের গুণে সংসারের সকলের ওপর তাঁর খুবই প্রভাব ছিল। রামমোহন তাঁর মাকে যেমন ভক্তি করতেন, তেমনি ভয়ও করতেন। ছেলেবেলায় রামমোহনের ধর্মশিক্ষা তাঁর মায়ের কাছেই হয়েছিল। হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মের মাহাত্ম্য, শাস্ত্রের অলৌকিক কাহিনী আর পুরাণের রোমাঞ্চকর কত গল্প—এসবই তিনি মায়ের মুখে শুনতেন। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল রামমোহনের বাল্য ও শৈশব জীবন।

তিন

একদিন রামকান্ত তারিণীদেবীকে বললেন, রামের তো পাঁচ বছর বয়স হলো এবার ওকে পাঠশালায় পাঠাতে হয়।

—এত তাড়াতাড়ি কেন ? আর একটু বড় হোক।

—এই তো পাঠশালায় যাবার বয়স। তোমার ছেলের যে রকম বুদ্ধি—

—আমার ছেলে ! ও বুঝি তোমার ছেলে নয় ?

—না—রাম তোমারও নয়, আমারও নয়, ও রায়বংশের ছেলে—

—তার চেয়ে বলো না কেন রাধানগরের ছেলে।

—তাই যদি বলো ফুলবৌ, তাহলে আমি বলব আমাদের রাম বাংলাদেশের ছেলে। আমি বিদ্যাবাগীশকে দিয়ে ওর ঠিকুজী করিয়েছি।

—ঠিকুজীতে কি আছে, বলো না ? ছেলে পণ্ডিত হবে তো ?

—পণ্ডিত ! দিক্-বিজয়ী পণ্ডিত হবে তোমার এই ছেলে।

—ধার্মিক হবে ?

—ঐখানটাতেই একটু গোলমাল রয়েছে। বিদ্যাবাগীশ বলেছেন

ধার্মিক হবে। তবে তোমার এই ছেলে আমাদের হিন্দুধর্ম মানবে না। তাই ভাবছি পাঠশালায় না পাঠিয়ে ওকে বিদ্যাবাগীশের চতুষ্পাঠীতেই আগে পাঠিয়ে দিই। সংস্কৃত শিখবার সঙ্গে কিছু শাস্ত্র জ্ঞান হোক, তাহলে হয়তো ধর্মে, মানে আমাদের বংশগত ধর্মে, ওর মতিগতি হবে। শাক্তের রক্ত ও বৈষ্ণবের রক্ত দুটোই আছে রামের শরীরে—

—সেই জন্যেই তো ঠাকুর-দেবতায় এখন থেকে ওর কেমন ভক্তি কেমন বিশ্বাস—

—ভগবান করুন তার এই ভক্তি আর বিশ্বাস অটুট থাকুক।

দেশে লেখাপড়ার চর্চা তখন ছিল না বললেই হয়।

যা ছিল তা হলো গুরুমশাই-এর পাঠশালা, ভট্টাচার্যের টোল বা চতুষ্পাঠী আর মৌলভীদের মক্তব। পাঠশালার শিক্ষা বলতে ছিল কিছু শুভঙ্করী আর কিছু চিঠি লিখবার নিয়মকানুন। টোলে দেওয়া হতো সংস্কৃত শিক্ষা। রামমোহনের জন্মেরসময় যদিও নবাবী আমল শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু কোর্ট কাচারীতে আরবী ও ফারসী ভাষার চল ছিল। এই দুটো ভাষারই কদরটা ছিল তাই বেশি। মৌলভীদের মক্তবে শিখতে হতো এই দুটো ভাষা। রামমোহন ছেলেবেলায় এই তিন রকমের স্কুলেই পড়েছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়েই তাঁর বিয়ে হয়।

তোমরা হয়ত এ কথা শুনে অবাক হবে।

কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কুলীন বামুনরা একটার বেশি বিয়ে করত আর ছেলে-মেয়েদের খুবই ছেলেবেলায় বিয়ে হতো। রামমোহনেরই তো তিনটে বিয়ে। আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম বার বিয়ে হয়। অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম স্ত্রী মারা গেলে, রামকান্ত ছেলের আবার বিয়ে দিলেন; এক বছরের তফাতে ছেলের তিনি 'দু'বার বিয়ে দিয়ে কুপ্রথার পতাকা উড়িয়েছিলেন। বড় হয়ে হিন্দু সমাজ থেকে রামমোহন নিজেই তো

এই প্রথা দুটির মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম শ্রীমতী দেবী আর তৃতীয়ার নাম ছিল উমাদেবী। রামকান্তের তিন বিয়ে ছিল, পুত্র রামমোহনের ভাগ্যে তাই ঘটেছিল। এসবই তাঁর জীবনের নয় বছর বয়সের ঘটনা ছিল।

বিয়ে-থা চুকে গেল। এইবার রামকান্ত ছেলের লেখাপড়ায় মন দিলেন। এই ছেলে থেকেই একদিন বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে, কুলপুরোহিত এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। রামকান্ত সেটা খুব বিশ্বাস করতেন। সেইজন্যেই তো রামমোহনের ওপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁর নিজের মনও বলতো—তাঁর এই পুত্র ক্ষণজন্মা। রামমোহন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি রায় বংশের প্রথা এবং পিতার ইচ্ছানুসারে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন, আর সংস্কৃত ভাষা শেখেন তাঁর মাতৃবংশের প্রথানুসারে।

রাধানগরের পাঠশালা ও টোলে শিক্ষার প্রাথমিক পর্বটা শেষ হয়ে গেলে, রামকান্ত ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন প্রথমে পাটনায়, পরে কাশীতে। বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন বলতে তখন বিশেষ কিছুই ছিল না—বাংলা ভাষাই তো তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সে তুলনায় ফরাসী ভাষার চল ছিল বেশি। গ্রামের পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলভীর কাছে বালক রামমোহন আরবী ফারসী ভাষাও শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। এতটুকু ছেলের স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দেখে গুরুমশাই ও মৌলভী দুজনেই চমৎকৃত হয়েছিলেন।

রাধানগরে বাল্যশিক্ষা শেষ হলে রামকান্ত ছেলেকে পাটনায় পাঠিয়ে দিলেন। তখন রামমোহনের বয়স ন বছর। রামকান্ত ভেবেছিলেন, ছেলে যদি ভাল করে আরবী ও ফারসী শিখতে পারে তাহলে নবাব সরকারে একটা ভাল চাকরী সুনিশ্চিত। কিন্তু আমরা দেখব, রামমোহনের ভাগ্যবিধাতা তাঁর জন্য অন্য রকমের ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলেন—নবাব সরকারে নয়, কোম্পানীর সরকারেই তিনি

উচ্চপদের চাকরি করেছিলেন। রামমোহন পাটনায় এলেন। তখন ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র ভালভাবে পড়তে হলে এখানে আসতে হতো। পাটনা ছিল এর একমাত্র কেন্দ্র। এখানে অনেক বিদ্বান মৌলভী বাস করতেন ; তাঁরা এই দুটো বিষয়ের চর্চা করতেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের তুলনায় তখন আরবী ফারসী ভাষা খুব উন্নত ছিল। এমন উন্নত ছিল যে, এই দুটো ভাষার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানবিদ্যার পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল।

রামমোহন মেধাবী ছিলেন। যে দু' তিন বছরকাল তিনি পাটনায় তাঁর ছাত্রজীবন কাটিয়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। এমনভাবে শিখেছিলেন যেন এই দুটোই তাঁর মাতৃভাষা। মূল আরবী ভাষায় তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতি ও এ্যারিস্টটলের বই পড়ে শেষ করেছিলেন। এর ফলে রামমোহনের স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হলো। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর এই বয়সেই জন্মালো অসাধারণ অধিকার। তাইতো উত্তরকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন অদ্বিতীয় তর্কযোদ্ধা। পাটনায় শিক্ষাকালে তিনি ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান পড়লেন ; পড়লেন সুফীদেরও বই।

কোরান পাঠ করে কিশোর রামমোহনের মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। তখন থেকেই তাঁর মনে প্রচলিত হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে যায়। কোরানের অনেক বাণী তাঁর মর্মস্পর্শ করেছিল। যে নারীজাতির পক্ষ নিয়ে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে রামমোহন আজীবন যুদ্ধ করেছিলেন তার প্রথম পাঠ তো তিনি কোরান থেকেই পেয়েছিলেন। 'নারীজাতির প্রতি সর্বদা সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করিবে'—কোরানের এই নির্দেশটি যেন কিশোর রামমোহনের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের এই পবিত্র শাস্ত্র থেকে সবচেয়ে বড়ো উপদেশ তিনি যা লাভ করেছিলেন তা হলো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। রামমোহনের লেখা

ঈশ্বর-বিষয়ক অনেক জ্ঞানের মধ্যে তাঁর এই ধারণা ফুটে উঠেছে দেখা যায়। সব ধর্মের মধ্যে একদল থাকে যারা খুব গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ। এ জিনিস হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। আবার একদল আছে যারা হৃদয়ের অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে গ্রহণ করে। এইভাবে গোঁড়ামি বর্জন করে যেসব মুসলমান কোরানের মর্ম গ্রহণ করতো। তাদের মধ্যে 'সুফী ও মোতাজেলরা খুব বিখ্যাত। সুফীদের মানবপ্রেমও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পাটনায় আরবী ফারসী পড়া শেষ হলো।

রাধানগর থেকে পিতার নির্দেশ এলো—'আমার ইচ্ছা এইবার তুমি কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর ও হিন্দুশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হও।' পিতার আদেশ শিরোধার্য করে রামমোহন এলেন কাশীতে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল তখন কাশী। ভারতের নানা অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিতরা তখন এখানে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করতেন। হিন্দু ভারতের হৃৎপিণ্ড এই কাশীধামে আবহমান কাল থেকে হিন্দুত্বের ধ্বজা উড্ডীন হয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে আসছে। গঙ্গার তীরে হিন্দুর এই তীর্থে এলেন ছাত্ররূপে রামমোহন। রামমোহনের দাদামশাই রামকান্তকে বলেছিলেন' তোমার এই ছেলে বিধর্মী যাতে না হয় সেজন্য তাকে সংকৃত শিক্ষা দেবে ভাল করে। বিধর্মী হবে কেন ?—জামাতার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্যাম ভট্টাচার্য বলেছিলেন, পুত্রের জন্মপত্রিকায় গ্রহের সংস্থান দেখে তাইতো আশংকা হয়। এই আশংকা যাতে সত্যে পরিণত না হয় সেজন্যই তো রামকান্ত পুত্রকে নির্দেশ দিলেন হিন্দুশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবার জন্য।

রামমোহন এলেন কাশীতে।

তখন তাঁর বয়স বারো বছর।

কোরানের একেশ্বরবাদ' সুফীদের উদার মানবপ্রেম রামমোহনর মনকে তখন ভরিয়ে রেখেছিল। এবার তিনি পাঠ করলেন পবিত্র আর্যশাস্ত্র—বেদ ও উপনিষদ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এইসব শাস্ত্রে

আশ্চর্য রকমের জ্ঞান লাভ করলেন। পরিচিত হলেন হিন্দুসাধনার মর্মের সঙ্গে। তখন তিনি দেখতে পেলেন ইসলামের একেশ্বরবাদ ও বেদান্তের ব্রহ্ম—এই দুটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই ধারণা যতই তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে ততই তাঁর চিন্তাজগতে শুরু হয় বিরাট আলোড়ন। উপলব্ধি করলেন তিনি হিন্দুদের প্রতিমা পূজার অসারতা। এক ঈশ্বর—নিরাকার ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু সত্য নয়। এই মতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী হলেন।

ষোল বছর বয়সে রামমোহন ফিরে এলেন রাধানগরে।

ফিরে এলেন তিনি একটি বিশ্বাস নিয়ে।

যে বিশ্বাসের সঙ্গে রায়-পরিবারে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের কোন মিল ছিল না। হিন্দুধর্মের অসংখ্য বিধিনিষেধ ও সংস্কারবন্ধন কিশোর রামমোহনের মনে সংশয় জাগিয়ে তুলেছিল। হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচার-আচরণ সেই সংশয়কে করেছিল আরো দৃঢ়। তাঁর চিন্তায় তখন একেশ্বরবাদ ছাড়া অন্য কিছুরই স্থান ছিল না—না প্রতিমার, না কোন ঠাকুর-দেবতার। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে অনেক তর্ক, অনেক আলোচনা হলো। এরপর রাধানগরের বাড়িতে বসে হিন্দুদের পুতুল পূজো নিয়ে তিনি লিখলেন একটা ছোট্ট বই। অসন্তুষ্ট হলেন রামকান্ত, অসন্তুষ্ট হলেন তারিণীদেবী ও বাড়ির সবাই। সকলের রাগ গিয়ে পড়লো রামমোহনের ওপর। রামকান্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: 'আমার বাড়িতে বিধর্মীর স্থান নেই।'

পুত্রের কণ্ঠেও প্রতিবাদ উঠল।

তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

এরপর রামমোহন দীর্ঘ ভ্রমণ করেন।

আরও সত্যকে জানবার জন্য গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে মাত্র ষোল বছর বয়সে কেউ গৃহত্যাগ করেছেন বলে কখনো শোনা যায় না—না এদেশে, না ওদেশে। রামমোহন নিজেই লিখেছেন, 'এই

সময়ে আমি পৃথিবীর অনেক দূর দেশে গিয়েছি। কখনো সমতল ভূমিতে, কখনো বা পার্বত্য প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি।' যেদিন যে সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি হয়ত মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে থাকবেন—'আমি হিন্দুধর্মের সংস্কার করব। পুতুল পূজোর গ্লানি থেকে রক্ষা করব আর্যধর্মের চিরন্তন মহিমাকে। পুরুতদের হাত থেকে বাঁচাব আমাদের ধর্মের যা সার সত্য তাকে।' দণ্ডপানি সমাজদেবতার ভ্রূকুটি বা রক্তচক্ষু সেই কিশোরকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি সেদিন।

চির অকুতোভয় রামমোহন গৃহত্যাগ করলেন।

ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে ভারতপথিক রামমোহনের মন বাঁধা পড়বে কেন? এইসময়ে ভারতের বহুস্থান ঘুরে তিনি শুধু ধর্মের পরিচয়ই সংগ্রহ করেন নি—ভারতের সমাজীবনের সকল স্তরই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন সেদিন। তিনি ছাড়া আর দেখবে কে? আর তো কেউ ছিল না তখন তাঁর মতন। তাঁর দুই চোখ যেন দশ চোখ হয়ে শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রত্যেকটি বিষয় গভীর ভাবে দেখে নিয়েছিল। বাংলায় তখন সংস্কৃতি বা রুচি বলতে কিছুই ছিল না—বিদ্যাসুন্দরী রুচির স্থূলতার বেশি কিছু তখন ছিল না। এখন ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে পেলেন গোটা ভারতবর্ষেরই এক অবস্থা—সবই যেন একই ধারায় চলেছে। বাংলাদেশে যে অন্ধকার, যে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার দেখেছিলেন, বাংলার বাইরে সব জায়গাতেই তিনি সেই একই জিনিস দেখতে পেলেন—দেখতে পেলেন ধর্মের নামে সর্বত্র কেবল পুতুল পূজোর আড়ম্বর; ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পুরুতদের চলেছে ধর্মের ব্যবসা। রামমোহন এই সময়ে তিব্বতও ঘুরে এসেছিলেন। সেখানেও তিনি লামাদের মধ্যে এই একই জিনিস দেখে এসেছিলেন—সেই কুসংস্কার আর ধর্মের ভড়ং।

হিন্দু সমাজের এই অবস্থা দেখে রামমোহন সংকল্প করলেন তিনি দু'হাত দিয়ে কুসংস্কারের জঞ্জাল পরিষ্কার করবেন; জ্ঞানের মশাল

জ্বেলে দূর করবেন শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকার, আর নির্জীব সমাজদেহে করবেন নতূন জীবনের সঞ্চার। সমাজপতির রক্তচক্ষুর কাছে ব্যক্তি মানুষ যাতে আর উপেক্ষিত না হয়ে থাকে, তারই চেষ্টা করবেন তিনি। ধর্মের মন্দিরে নৈবেদ্য সাজিয়ে যারা সত্যকে আছন্ন করে রেখেছে তাদের ভণ্ডামীর মুখোশ তিনি খুলে দেবেন। স্বাধীন চিন্তার আতস বাজী জ্বালাবেন তিনি—বিচার-বিবেচনার পরিবেশ রচনা করবেন। ধর্ম যে একটা জীবন্ত সত্য, খেলার জিনিস নয়—এটাই তিনি তাঁর দেশবাসীকে বোঝালেন।

১৭৯৪ সালে দীর্ঘ পর্যটন শেষ করে, চার বছর বাদে গৃহে ফিরে এলেন। রামমোহন যখন অজ্ঞাতবাসে রায় পরিবারে তখন একটু পরিবর্তন ঘটে গেছে। রায়রা ছিলেন একান্নবর্তী পরিবার—তখনকার বাংলায় এই প্রথাটি হিন্দু পরিবারের মধ্যে বলবৎ ছিল। রামকান্ত রাধানগরের পৈতৃক বাড়িতে তাঁর অনান্য ভাইদের সঙ্গে একত্রে বাস করতেন। তবে তাঁর আহারের ব্যবস্থা পৃথক ছিল অর্থাৎ তাঁর রান্নাঘরটা ছিল আলাদা। কালক্রমে এই পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যখন রাধানগরের বাড়িতে সকলের স্থানাভাব হয়। এই-জন্য ১৭৯১ সালে রামকান্ত কাছাকাছি লাঙ্গুলপাড়ায় একটা নতুন বাড়ি করে উঠে এলেন। তাঁর অবস্থা অনুযায়ী লাঙ্গুলপাড়ায় এই-বাড়ি ছিল বেশ বিরাট। ষোল বিঘা জায়গায় ওপর ইটের দোতলা পাকা বাড়ি, ইটের রান্নাঘর বৈঠকখানা ও নাটমন্দির। বাড়ির কাছেই বিরাট বাগান। সেখানে অন্যান্য গাছের সঙ্গে ছিল একশোটা আম গাছ, দুশো তালগাছ ও সাতশো নারকেল গাছ। তিনটে প্রকাণ্ড পুকুর। সব মিলিয়ে রামকান্তর লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি এক মূল্যবান সম্পত্তি। এটি ছিল তাঁর নিজস্ব।

এই সময় রামকান্তর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল।

তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে ভুরসুট পরগনা নয় বছরের জন্য ইজারা নিয়েছিলেন। এই ইজারার জন্য জামিন হন তাঁর বড়ছেলে

জগমোহন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জগমোহন এর মধ্যেই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিষয়কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কোম্পানী যখন তাঁকে তাঁর বাবার জমিদারস্বীকার করে নিল তখন এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিজেও বেশ কিছু সম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। জগমোহন নিজের নামেও মেদিনীপুরে একটা বড় তালুক কিনেছিলেন। রামকান্ত কলকাতায় চিৎপুরে একটা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। সকল দিক দিয়েই রামকান্ত রায় তখন পুরোদস্তুর একজন জমিদার।

তাঁর মন কিন্তু সব সময় রামমোহনের কথা চিন্তা করত। এমন কি তারিণী দেবীও মাঝে মাঝে উতলা হয়ে স্বামীকে বলতেন, হ্যাগা, একটু খোঁজ-খবর নিলে না ছেলেটার।

তার কি বাকী রেখেছি, ফুল বৌ! রামের জন্য আমারও মনটা মাঝে মাঝে কি কম অস্থির হয়? এই যে এত বিষয়-সম্পত্তি করলাম এখন সে যদি এসে তার দাদার সঙ্গে মিলেমিশে দেখাশুনা করে তা'হলে আমি নিশ্চিত মনে মরতে পারি।

তুমি আবার লোক পাঠাও।

তাও বাকী রাখিনি। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থে তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছি, যারা গেছে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি একটা করে চিঠি আর একটা করে একশো টাকার তোড়া পাঠিয়েছি। এদের অনেকেই রামকে চেনে। এবার এমন জাল ফেলেছি, ফুল বৌ, সেই জালে তোমার গৃহত্যাগী ছেলেকে টেনে তুলবই।

স্বামী-স্ত্রীতে যখন এই রকম আলাপ হতো সেই সময়ে একদিন হঠাৎ রামমোহন ফিরে এলেন রাধানগরে। ফেরার পথে তাঁরই খোঁজে রামকান্তর পাঠানো লোকজনের সঙ্গে এক জায়গায় তাঁর দেখা হয়েছিল। সাবেক বাড়িতে এসে শুনলেন রামকান্ত নতুন বাড়ি করে লাঙ্গুলপাড়ায় উঠে গেছেন। কাল বিলম্ব না করে রামমোহন সেখানে চলে এলেন। পুত্রের গৃহত্যাগের পর থেকে তার সুমতির জন্য তারিণী দেবী গৃহদেবতার কাছে কত আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন! ঠাকুর,

রামের সুমতি হোক, সে যেন কালাপাহাড় না হয়। এতকাল বাদে পুত্র গৃহে ফিরতেই রায় পরিবারে যেন আনন্দের বান ডেকে গেল।

পিতামাতার স্নেহলাভ করলেন আবার রামমোহন। রামকান্ত তাঁকে বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করতে বললেন। ছয়মাস কেটে গেল। বিষয় সম্পত্তি দেখা শুনা নয়, গভীর শাস্ত্রচর্চার মধ্যে ডুবে রইলেন রামমোহন। রামকান্ত ছেলের সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, রামমোহন যা ছিলেন তাই আছেন—তাঁর মতিগতি কিছুমাত্র বদলায়নি। পুত্র স্নেহ একদিকে, সমাজ আর একদিকে। এককে রাখতে গেলে অন্যকে ত্যাগ করতে হয়। সমাজ বড়। রামকান্ত সমাজকে ত্যাগ করতে পারেন না, বিধর্মী পুত্রকেই তিনি ত্যাগ করলেন। রামমোহন আবার গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন।

চার

প্রথম বার রামমোহন একা গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার সপরিবারে। তাঁর সঙ্গে চললেন তাঁর দুই স্ত্রী। এবার রামকান্ত ছেলেকে কিছু অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামমোহন তা গ্রহণ করলেন না। নিজের ওপর ছিল তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। কাশীতে এসে তিনি বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে পাঠ করলেন। এইখানে তাঁর ইংরাজী শিক্ষার হাতেখড়ি। আবার এইখানেই তাঁর বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়। রামমোহনের বয়স তখন বাইশ বছর। তিনি যখন কাশীতে, তখন, রামকান্ত তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেন।

রামমোহনকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেটা সমাজের ভয়ে। কিন্তু পুত্রকে তিনি যে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেননি তা তাঁর বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা থেকে পরিষ্কার জানতে পারা যায়। বিধর্মী হোক আর যাই হোক, তাঁর এই পুত্র যে ক্ষণজন্মা এ বিশ্বাসে রামকান্ত অটল ছিলেন। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ির কিছু অংশ আর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি—এই পেয়েছিলেন রামমোহন। রামকান্ত তাঁকে

সম্পত্তি দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর মা। স্বামীর মৃত্যুর পর তারিণী দেবী হলেন গৃহকর্ত্রী। রামমোহন বিধর্মী, তাই তিনি তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন। ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। তবু বিষয় সম্পত্তির লোভে রামমোহন তাঁর মায়ের সঙ্গে আপোষ করলেন না।

১৮০৩ সাল।

রামকান্তের মৃত্যু হলো। পিতার মৃত্যুকালে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। বাড়িতে রামকান্তের যে পারলৌকিক কাজ হলো, রামমোহন তাতে যোগদান করলেন না ; তিনি কলকাতায় আলাদাভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন। এতে রায়-পরিবারের অনেকেই যেমন অসন্তুষ্ট হলেন, তেমন রাধানগরের সমাজও কিছুটা রুষ্ট হলো তাঁর প্রতি। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে রামমোহনের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হলো। এইবার তিনি রোজগারের চেষ্টা করলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য এক রকম স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেসব কাজ তাঁকে করতে হবে সেজন্য অনেক টাকার দরকার। সেই টাকা চাকরি করেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

তিন পুরুষ ধরে রায়েরা নবাব সরকারে চাকরি করে এসেছেন।

রামমোহন থেকেই এই ধারার বদল হলো।

নবাবী আমল তখন আর নেই।

বাংলায়—তখনকার বাংলা বলতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা—তখন কোম্পানীর আমল শুরু হয়েছে। ননতু যুগের নতুন ব্যবস্থা। আরবী ও ফারসী এখন কাজে লাগবে না। তখন আফিস-আদালতে ইংরেজী ভাষার আদর ক্রমেই বাড়ছিল। কালেক্টারের সেরেস্তাদার হতে পারলে আর ভাবনা ছিল না—এটাই তখনকার দিনে বড় চাকরি। রামমোহন এই চাকরিই করেছিলেন—তবে তিনি একদিনে সেরেস্তাদার বা দেওয়ান হননি। সামান্য একজন কেরানি হিসাবেই তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন।

ঢাকার কালেক্টার টমাস উডফোর্ডের অধীনে রামমোহনের চাকরি

শুরু হয় ১৮০৩ সালের জানুআরি। তখন থেকে বারো-তেরো বছর চাকরি করেছিলেন তিনি নানা জায়গায়। বেশীর ভাগ সময় চাকরি করেন রংপুরে কালেক্টার জন ডিগবির অধীনে তাঁর সেরেস্তাদার বা দেওয়ান হিসাবে। উডফোর্ড সাহেব যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ বদলি হয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর মুন্সী রামমোহন। মুর্শিদাবাদ থেকেই বেরুলো রামমোহনের প্রথম বই। বইটির নাম 'তুহ্‌ফাৎ-উল্ মুয়াহহিদীন' ; ফারসী ভাষায় লেখা। এর বাংলা মানে হলো 'একেশ্বর বাদীদের প্রতি উপহার'। এই বই সম্পর্কে পরে বলছি, এখন তাঁর কর্মজীবনের কথাই বলি।

রামমোহন মুর্শিদাবাদে বেশিদিন ছিলেন না। কাস্টোর উডফোর্ড অসুস্থ হয়ে চাকরি ছেড়ে বিলাত চলে গেলেন। তখন তিনি নতুন চাকরির চেষ্টায় হাজির হলেন জন ডিগবির কাছে। এঁর সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই আলাপ ছিল। সেকালে কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যে সব সিবিলিয়ান বিলাত থেকে এদেশে আসতেন তাঁদের সবাইকে কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়তে হতো। সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায়—সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসীতে অল্পবিস্তর শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১৮০০ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল কলকাতায়।

ডিগবি তখন রামগড়ের রেজিষ্ট্রার।

রামমোহন তাঁর মুন্সী নিযুক্ত হলেন।

এখন থেকে রামমোহন তাঁর সঙ্গেই রইলেন। এইখানে ডিগবি যখন মাস তিনেক অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল ছিলেন তখন ঐ তিন মাস রামমোহন ফৌজদারী কোর্টের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। রামমোহন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ছিলেন, লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট, বলিষ্ঠ আকৃতি ; চোখে-মুখে প্রতিভার ছটা। সমস্ত শরীরের মধ্যে তাঁর মাথাটা ছিল প্রকাণ্ড। তার উপর ছিল ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে একটি আকর্ষণীয় মানুষ। তাই কর্মজীবনে তিনি ধাপে ধাপে ওপরে উঠছিলেন দক্ষতা আর সততার জন্য। এইসবের জন্যই তো ডিগবি

সাহেব তাঁকে অত ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রামমোহন ত তাঁর মনিবের প্রতি সেই রকম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন।

জন ডিগবি রামমোহনের জীবনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এই সুন্দর স্বভাবের ইংরেজের সাহচর্য রামমোহনের জীবনেও অনেক উপকার সাধন করেছিল। রামমোহন যখন ডিগবির কাছে চাকরির জন্য এলেন তখন প্রাচ্যবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান। আরবী ও ফারসী ভাষা ভালভাবেই শিক্ষা করেছেন, সেইসঙ্গে ইসলাম শাস্ত্রগ্রন্থও অধ্যয়ন করেছেন গভীরভাবে। এর কিছুকাল আগে একটি বই লিখে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের পক্ষে এ-এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই সব কারণে প্রথম থেকেই ডিগবি রামমোহনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। মনিব হয়েও তিনি রামমোহনের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। এই বন্ধুত্বের সুবাদেই রামমোহন তাঁর কাছে ইংরেজী শিখেছিলেন, আর ডিগবি সাহেব শিখেছিলেন সংস্কৃত তাঁর কাছে।

রামগড়ের পর ডিগবি এলেন যশোর—সেখানকার কালেক্টর হয়ে।

মুন্সী রামমোহনও এলেন তাঁর সঙ্গে।

যশোর থেকে ডিগবি এলেন ভাগলপুর। রামমোহনও তাঁর পেছনে পেছনে এলেন। ডিগবি ম্যাজিস্ট্রেট, আর কালেক্টার ছিলেন হ্যামিলটন। ভাগলপুরের একটা ঘটনা এখানে বলি। এইঘটনা থেকে বুঝতে পারবে কি রকম প্রখর ছিল রামমোহনের আত্মসম্মান জ্ঞান। সে দিনটা ছিল ইংরেজী নববর্ষ—১৮০৯ সাল। সকালবেলা রামমোহন চলেছেন পাল্কী করে তাঁর বাসায়। সঙ্গে ছিল তাঁর চাপরাসী ও বরকন্দাজ। রাস্তার পাশে একটা ইটের পাঁজার ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন কালেক্টার স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন। হ্যামিলটন সাহেব একজন দেশীয় লোককে এই রকম রাজকীয় ভাবে যেতে দেখে রাগে যেন

ফেটে পড়লেন। তিনি চিংকার করে পাল্কী থামাতে আদেশ দিলেন। পাল্কী থামল না। সাহেব অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন। রামমোহনের শিষ্টাচার বোধ বিলক্ষণ ছিল। তিনি পাল্কী থেকে নেমে হ্যামিলটনকে যথাযথ অভিবাদন করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হ্যামিলটন তাঁকে অযথা গালাগাল করলেন।

রামমোহন মুখে কিছু বললেন না। পাল্কী করে নিজের গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। এতো শুধু তাঁর অপমান নয়, এ যে সমগ্র ভারতবাসীর অপমান। এই অপমানের প্রতিকারের জন্য তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে আবেদন করলেন। আবেদন-পত্রটি তিনি ইংরেজিতেই লিখেছিলেন। তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠল আত্মসম্মান বোধ। সমগ্র আবেদন-পত্রটির মূল বক্তব্য ছিল—'এই এদেশের লোকরাও মানুষ, ইংরেজের ন্যায় বিচারের সেও সমান অধিকারী। তাকে অযথা অপমান করার অধিকার কারো নেই।' সমস্ত ঘটনা জানার পর বড়লাট কালেক্টারকে এক কড়া চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন ভবিষ্যতে দেশীয় লোকদের সঙ্গে এই রকম অভদ্র ব্যবহার না করেন।

রামমোহনের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রইল। সেইসঙ্গে ইংরেজের ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ভাগলপুরের ডিগবি এলেন রংপুর। এখানে তিনি রামমোহনকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। রামমোহন শুধু কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন না, তিনি ডিগবিরও দেওয়ান ছিলেন। সেকালে দেশীয় লোকের সঙ্গে কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখতেন। এঁদের দেওয়ান বলা হতো। রামমোহনের সঙ্গে ডিগবির এইরকম সম্পর্কই ছিল। বলেছি, রংপুরেই তাঁর কর্মজীবনের অনেকগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এখানেই রামমোহনের ইংরেজী চর্চায় জোয়ার এসেছিল। এখানেই তিনি সরকারি কাজের অবসরে বিলাতি সংবাদ-পত্রগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা

সম্বন্ধে নিজেকে পরিচিত করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিলাতি ডাকে ইংলণ্ড থেকে কালেক্টারের কাছে যে সব কাগজপত্র আসত তিনি সেগুলি চেয়ে নিয়ে পড়তেন।

সেরেস্তাদাররা সাধারণত তোষামোদপ্রিয় হতেন। সাহেবের মন যুগিয়ে চলতেন তাঁরা। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন অসত্যবাদী আর উৎকোচ গ্রহণে তৎপর। রামমোহন এই ধরনের সেরেস্তাদার ছিলেন না। অন্যদিকে বেশির ভাগ সিবিলিয়ান ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। ভদ্রতা বা শিষ্টাচারের বালাই ছিল না তাঁদের মধ্যে। রামমোহনের স্বাধীনপ্রকৃতি এ ক্ষেত্রেও আপোষ করতে পারেনি। তিনি নিজের উন্নত চরিত্রবলে তাঁর ইংরেজ মনিবদের কাছ থেকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার আদায় করে নিতে পারতেন। এইজন্য সাহেবরাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করতেন।

ডিগবির অধীনে রামমোহন মোট দশ বছর চাকরি করেছিলেন।

সততা ও দক্ষতার গুণে কেরানি থেকে তিনি দেওয়ান হয়েছিলেন।

দশ বছর চাকরি করার পর রামমোহন দেখলেন, তিনি যে টাকা উপায় করেছেন তা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। সেই টাকা দিয়ে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তি করলেন, গোটা দুই তালুকও কিনলেন বর্ধমান জেলায়। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পেয়েছিলেন, তেজারতি কারবার করেও কিছু টাকা তিনি করেছিলেন। এখন আর চাকরির দরকার নেই, এইবার তিনি তাঁর জীবনের ব্রত পালন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ডিগবি বিলাত চলে গেলে তিনিও রংপুর ত্যাগ করেন। রংপুরে বাস করবার সময় নিজের বাসাতে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তিনি ধর্মসভা করতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রচার করতেন ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। এ ছাড়া রংপুরে থাকার সময়ই তিনি ফারসী ভাষায় কয়েকটি ছোট বই ও বেদান্তের কিছু অংশের অনুবাদও করেছিলেন। এ সবই ছিল তার ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব।

১৮১৫ সাল।

রামমোহন কলকাতায় এলেন।

কলকাতা তখন সারা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র।

কোম্পানীর পূর্ণ আধিপত্যে মহানগরী ঝলমল। এ শহর তাঁর কাছে নতুন নয়, পুরাতন। তাঁর যখন পঁচিশ বছর বয়স তখন থেকেই কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। একবার নয়, এর মধ্যে অনেক বারই তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই শহরকে কেন্দ্র করে তাঁর ছিল অর্থ উপার্জনের বহুমুখী প্রচেষ্টা। কিন্তু এবার তিনি এলেন নবযুগজীবনের হোতা রূপে। রংপুরে থাকার সময় স্বদেশের সমস্ত রকম অজ্ঞানতা দূর করার জন্য যে সাধনার তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, কলকাতায় এলেন তারই পূর্ণ পরিণতির আশায়। তিনি বুঝেছিলেন কলকাতায় এসে বসবাস করতে না পারলে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ চরিতার্থ করতে পারবেন না।

তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ। শরীরে অসামান্য শক্তি, মনে অমিত তেজ, হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ। এই সম্পদ সম্বল করেই তো রামমোহন কলকাতায় এসে তাঁর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁর নাম কলকাতার বিশিষ্ট সমাজে খুবই পরিচিত। কলকাতা আসবার আগে তিনি এখানে দুটো বাড়ি কিনেছিলেন; তার একটা বাড়ি ছিল মানিকতলায়, অপরটি চৌরঙ্গীতে। মানিকতলার বাড়িতেই রামমোহন তাঁর নতুন জীবন শুরু করলেন। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর কর্ম জীবনের বিকাশ পর্ব। এই মানিকতলার বাড়িতে বসেই পনর বছরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি রচনা করেছিলেন একটা নতুন যুগ।

রংপুরে থাকার সময় রামমোহন ঘরোয়া সভায় শাস্ত্র নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। সে কথা আগেই বলেছি। এই আলোচনাকে উপলক্ষ্য করে সেদিন একটি ছোটখাট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

এর কেন্দ্র-পুরুষ ছিলেন রামমোহন। সেখানে কিছুসংখ্যক সভ্যের উপস্থিত ছিল নিয়মিত। ধীরে ধীরে তাঁরা হয়ে উঠলেন রামমোহনের সমর্থক। কিন্তু রংপুরের পাট উঠিয়ে তিনি যখন এলেন কলকাতায় তখন তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল এই সব সমর্থকদের সঙ্গে। তাই নতুন পরিবেশে প্রয়োজন হলো নতুন করে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা। রামমোহন তৎপর হলেন।

কলকাতায় আসার পর অল্প দিনেই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত হলেন শহরের বিত্তবানদের সমাজে, অভিজাতদের সমাজে। তাঁর ধন-সম্পত্তি, তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি ও তাঁর পাণ্ডিত্যে অনেকেই আকৃষ্ট হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে রামমোহন গঠন করলেন 'আত্মীয়সভা'। জাগরণ-যজ্ঞের যে আয়োজন তিনি করেছিলেন তারই বেদী ছিল এই আত্মীয়সভা। এখানে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, নন্দকিশোর বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নব জাগরণের সূচনাকালে এটাই ছিল প্রথম সমষ্টিগত প্রয়াস।

কলকাতায় এসে রামমোহন যেন সমস্ত দেশের হৃৎস্পন্দন অনুভব করলেন। কী শোচনীয় অবস্থা হিন্দু সমাজের। সমস্ত দেশ অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সর্বত্রই প্রতিমাপূজার প্রভাব। বেদ-উপনিষদের কথা কেউ বলে না। কেউ জানে না। কাশীতে দেখে এসেছেন শাস্ত্র আলোচনার কি সমারোহ, আর এখানে বামুন পুরুতদের মধ্যে যত অপশাস্ত্রের আলোচনা; সত্যকার শাস্ত্রের মর্ম অনুধাবন করার কিছুমাত্র ইচ্ছা তাদের মধ্যে একজনেরও নেই। আর তাদেরই অনুশাসনে চলছে সমস্ত দেশ, জাতি ও সমাজ। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তিনি আরো অনুভব করলেন, লোকে স্বাধীন চিন্তার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে

ফেলেছে। সমাজের নৈতিক জীবন কলুষিত, মেয়েদের জীবন অসহায়। অবাধে চলেছে সমাজের বুকে কত রকমের নৃশংস প্রথা। কোথাও চিত্তের নির্মলতা নেই, চরিত্রের পবিত্রতা নেই। সবই যেন স্থবির ও পাষাণ। দেশের কোথাও শিক্ষা নেই, জনসাধারণের হিতকর কোন সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেই।

দেশের এই শোচনীয় অবস্থা রামমোহনকে বিচলিত করল। ভারাক্রান্ত করে তুললো তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ককে।

তখন সেই যুগসারথি বুঝলেন কি বিপুল কাজ তাঁর সামনে।

ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি আর সকলের ওপর মেয়েদের অধিকারের প্রতিষ্ঠা—এতগুলো বিষয়ের উন্নতি সাধন করতে হবে। কলকাতায় এসে রামমোহন এইসব কাজই শুরু করে দিলেন একে-একে। কলকাতা থেকেই বেজে উঠেছিল তাঁর রণভেরী। পুতুল পূজো আর সব রকম অপধর্মের বিরুদ্ধে তিনি যেন একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আত্মীয়সভার মঞ্চ থেকে তিনি শঙ্খধ্বনি করলেন। অমনি কলকাতায় হুলস্থুল পড়ে গেল। কেবল কলকাতায় কেন, সমস্ত বাংলা দেশে বয়ে গেল আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। বাবুদের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যির টোলে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে সেখানে তখন রামমোহনের কথা। অন্তঃপুরেও ছড়িয়ে পড়ে সেই জাগরণের তরঙ্গ।

কলকাতায় এসে এক বছর পরে রামমোহন তাঁর মানিকতলার বাড়িতে স্থাপন করলেন আত্মীয়সভা। এখান থেকেই তিনি নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্মপ্রচার এবং জনমত গঠন—মোটামুটি এই ছিল সবের উদ্দেশ্য। সপ্তাহে একদিন করে এই সভার অধিবেশন হতো। সেখানে আসতেন দ্বারকানাথ, নন্দকিশোর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এঁরাই প্রথমে প্রকাশ্য ভাবে রামমোহনের মত গ্রহণ করেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়-সভাতে বেদপাঠ হতো, ব্রহ্মসংগীত হতো? এসব গানের বেশীর ভাগই

রামমোহন রচনা করতেন। সে সব গানে তাঁর একেশ্বরবাদ চিন্তাই ঝংকৃত হয়েছে। একটা গানে আছে :

ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে
যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল
কেহ নাহি জানে তাকে।

এই ভাবে একটা পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হতো। সেই পরিবেশের সংস্পর্শে যাঁরাই সেদিন এসেছিলেন তাঁরাই রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। মোট কথা, আত্মীয় সভা ছিল রামমোহনের সবরকম সংস্কার আন্দোলনের প্রথম সোপান। কলকাতায় এসে তিনি একে একে যেসব মহৎ কাজ সম্পন্ন করেন, এইবার আমরা সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

পাঁচ

একদিন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

দারুণ গরম।

হঠাৎ রামমোহন এসে হাজির হলেন তাঁর ইংরেজ শিষ্য এ্যাডাম সাহেবের বাড়ি। মিস্টার এ্যাডাম কলকাতার একজন নামকরা ব্যাপটিস্ট পাদ্রী। এঁর কাছেই রামমোহন গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন এবং এঁর সঙ্গে মিলেই বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন। তখন থেকেই এ্যাডাম সাহেব রামমোহনের শিষ্য হন ও একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। সেই এ্যাডামের বাড়িতে হঠাৎ অসময়ে রামমোহন এলেন। তাঁর মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখে এ্যাডামের ভয় হলো। তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: আপনার কি হয়েছে?

—আগে আমাকে একটু জল দাও। আর তুমি যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমার গায়ের এই আচকানটা খুলি। আমি বড় ঘামছি।

জল এলো। তিনি জল পান করে একটু সুস্থ হলেন।

—জানো এ্যাডাম, আমি আজ বড় দুঃখ পেয়েছি—

—দুঃখ পেয়েছেন! আপনি! মাই গড্!

—শুধু দুঃখ নয়, আঘাতও পেয়েছি।

—আঘাত! কে আপনাকে মারিল?

—বিশপ মিডলটন। তিনি আজ আমাকে এই বলে লোভ দেখালেন যে, আমি যদি খ্রীস্টধর্ম গ্রহন করি, তাহলে আমার পদ আরো বড় হবে।

আশ্চর্য।

—ছি ছি, মিডলটন আমাকে এতই ছোটলোক মনে করে।

এই ঘটনার পর রামমোহন আর মিডলটনের মুখ দর্শন করেন নি। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে, সেটা খুলে বলতে হয়। তখন খ্রীস্টান পাদ্রীরা আমাদের দেশে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করত আর হিন্দুদের নানারকমের লোভ দেখিয়ে খ্রীস্টান করত। রামমোহন কলকাতায় এসে পাদ্রীদের এই কাজের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, এদেশে যখন ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয় তখন বিলাত থেকে এসে একদল ব্যাপটিস্ট মিশনারী শ্রীরামপুরে ঘাঁটি করেন। এঁদের নেতা ছিলেন উইলিয়াম কেরী। শ্রীরামপুর থেকে পাদ্রীরা বাংলায় একটা কাগজ বের করেছিল। সেই কাগজটার নাম 'সমাচার দর্পণ'। একবার এর একটি সংখ্যায় একজন পাদ্রী হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রকে কটাক্ষ করে একটা প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, হিন্দু শাস্ত্রে যুক্তি বলে কিছু নেই; এই শাস্ত্র একেবারেই অসার।

লেখাটা রামমোহনের নজরে পড়ল। তিনি দেখলেন, পাদ্রী সাহেব এক নিঃশ্বাসে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। অমনি তিনি এর একটা প্রতিবাদ ঐ কাগজেই পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সমাচার দর্পণের সম্পাদক সেটি ছাপলেন না। ছাপবে

কি করে ? তিনি যে তখন গোঁড়া পাদ্রীদের চক্ষুশূল হয়েছেন। রামমোহন নিরস্ত হলেন না। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নাম দিয়ে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় একটা কাগজ বের করলেন। এর প্রথম সংখ্যার আলোচনার বিষয় ছিল 'ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ'। এই প্রবন্ধে তিনি তথ্য সহকারে দেখালেন, যদিও ইংরেজ শাসনের মূলনীতি হলো কারো ধর্মের নিন্দা করা হবে না, তথাপি একদল পাদ্রী এই নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ও এদেশীয় লোকদের খ্রীস্টান করবার চেষ্টা নানা ভাবে করেছেন। এজন্য তাঁরা কুৎসাপূর্ণ অনেক রকম বই ছাপিয়ে বিলি করেছেন আর প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খ্রীস্টান ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্ম নিকৃষ্ট এই ভাবে বক্তৃতা করেন। যদি কেউ খ্রীস্টান হয় তাকে চাকরি দেওয়া হয়।

খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে রামমোহনের যে শত্রুতা ছিল তা নয়। বরং এদের অনেক ভাল কাজের তিনি প্রশংসা করতেন এবং অনেক সময় শ্রীরামপুরে গিয়ে তাদের সঙ্গে উপাসনাতেও যোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে তাঁর বন্ধু ছিলেন, অনেকে তাঁর সংস্কার কাজের প্রবল সমর্থকও ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে রামমোহন শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কাজেরও প্রশংসা করতেন ; তেমনি তাঁরাও রামমোহনের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে উপকৃত হতেন। মিশনারিদের একটা ছাপাছানা ছিল কলকাতায়, তার নাম ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। কলকাতায় এসে বিবিধ সংস্কার কাজে ব্রতী হয়ে রামমোহন যতগুলি বিতর্কমূলক বই লিখেছিলেন সেগুলি এই প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল। আবার কলকাতায় বসে রামমোহন জনহিতকর যেসব কাজ করতেন তার খবর এই পাদ্রীদের চেষ্টাতেই সাগরপারে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এঁরা যখন থেকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন থেকেই রামমোহন এদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মের ওপর কেউ আঘাত করবে —এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

রামমোহনের চোখে সকল ধর্মই সমান ছিল। তাইতো আমরা

দেখতে পাই পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও তিনি 'খ্রীস্টের উপদেশ' নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন, এছাড়া খ্রীস্ট-ধর্ম সম্পর্কে আরো কয়েকখানা বই লিখেছিলেন। এজন্য তাঁকে একদিকে গোঁড়া হিন্দুদের কাছে যেমন অপ্রিয়ভাজন হতে হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে গোঁড়া পাদ্রীদের কাছেও তিনি তাই হয়েছিলেন। 'খ্রীস্টের উপদেশ' বইটিতে তিনি যীশুর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বাদ দিয়েছিলেন—এই অলৌকিকতার মোহ থেকে তিনি হিন্দু সমাজকেও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পাদ্রীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে তিনি যখন কলম ধরেন তখন কলকাতার বিশপ মিডলটন বৈষয়িক সুখের লোভ দেখিয়ে রামমোহনকে খ্রীস্টান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন সম্পর্কে এই বড় পাদ্রীটির ধারণা যে ভুল ছিল সেটা মিডলটন বেশ কিছুদিন পরে বুঝতে পেরেছিলেন।

কলকাতায় এসে রামমোহন যখন আত্মীয়সভা স্থাপন করেন তখন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ধর্মসভা স্থাপন করেন। এই রাধাকান্তের পূর্বপুরুষ ক্লাইভকে আশ্রয় দিয়ে তারই দৌলতে সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ইনি ছিলেন তখন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা। রামমোহনের বিপক্ষ দল একে সামনে রেখে তাঁর বিরোধিতা করতেন। রাধাকান্ত রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। ধর্মসভা আসলে ধর্মের সভা ছিল না—ছিল রামমোহনের নিন্দা করার জন্য একটা সভা। এই সভা থেকেই প্রচার করা হলো রামমোহন সমাজদ্রোহী, রামমোহন ঘোরতর পাষণ্ড, রামমোহনের ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোন মিল নেই। ধর্মসভার বেদী থেকে ভাড়াটে পণ্ডিত দিয়ে জোর গলায় এসব কথাই প্রচার করা হতো।

মানিকতলায় রামমোহনের আত্মীয়সভায় শুধুই যে তাঁর অনুরাগীরাই আসতেন তা নয়, অনেক স্থানীয় ইংরেজও এখানে আসতেন এবং এদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে হয়।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে এই হেয়ার সাহেবই ছিলেন অন্যতম। ঘড়ির ব্যবসা করতে এসেছিলেন কলকাতায়,তারপর কেমন করে যে তিনি বাংলা ও বাঙালীকে ভালোবেসে ফেললেন, তাঁর রোজগারের সমস্ত টাকা এই দেশের কল্যাণে খরচ করলেন, হিন্দু কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন—সে সব এক ইতিহাস। তোমরা হেয়ার সাহেবের জীবনী যখন পাঠ করবে তখন বুঝতে পারবে কেন তাঁকে মহামতি বলা হয় আর কেমন করেই বা তিনি নব্যবঙ্গের বিকল ঘড়িতে কল-বল দুই-ই যুগিয়েছিলেন। লোকে বলত হেয়ার সাহেব খ্রীস্টান হয়েও নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। তাঁর উপাস্য ছিল মানুষ। তাই তাঁকে আস্তিকের গুরু বলা চলে। হেয়ার সাহেব মাঝে মাঝে যখন মানিকতলায় আসতেন তখন তিনি রামমোহনের সঙ্গে ধর্মের প্রসঙ্গ নিয়ে মোটেই আলোচনা করতেন না—আলোচনা করতেন শুধু শিক্ষার বিষয় নিয়ে। হেয়ার সাহেবকে তাই বাংলার অন্যতম দীক্ষাগুরুও বলা হয়। রামমোহনের বাড়িতে এলে তিনি এখান থেকে না খেয়ে ফিরতেন না। মাগুর মাছের ঝোল তাঁর খুব প্রিয় ছিল ; হেয়ার সাহেব আসবেন জানতে পারলেই তাঁর পাচককে রামমোহন মাগুর মাছের ঝোল তৈরি করে রাখতে বলতেন।

বেদ ও বেদান্তের চর্চা তখন বাংলা দেশে ছিল না। অথচ হিন্দুধর্মের সারবস্তুই হলো এই বেদ ও বেদান্ত।

রামমোহন সংস্কার কাজের শুরুতেই প্রচার করলেন বেদান্ত গ্রন্থ। বাংলায় লেখা। ধর্মসংস্কার আন্দোলনে এটাই ছিল রামমোহনের ব্রহ্মাস্ত্র। হিন্দু ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদ ও বেদান্ত। শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত শাস্ত্র। একমাত্র বামুনদের মধ্যেই ছিল এর পঠন-পাঠন। তাঁরা বলতেন, শূদ্রেরা বেদ পড়তে পারবে না। রামমোহন বললেন, ধর্ম শুধু তোমাদের একার ? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ—এসব তো সকলেই পড়তে পারে আর তাদের পড়াও উচিত। এই বেদান্ত গ্রন্থ লিখে তিনি প্রমাণ করলেন যে, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ—

প্রতিমা পূজা পুতুল পূজার মতই খেলাখেলা। এই বইয়ের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন :

'আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার নির্দেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইয়াছি। সে নিন্দা বা তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়া যত বড় হউক না কেন, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করতে পারি যে, একদিন আসিবে যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এই সান্ত্বনা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না যে, আমার আন্তরিক অভিপ্রায়গুলি সেই পরমপুরুষের নিকট গ্রাহ্য যিনি গোপনে দেখিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।'

রামমোহনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার এই ঋণ আজো পরিশোধ করা হয় নি। সাধারণ লোকে 'বেদান্ত গ্রন্থ' বুঝতে পারবে না অনুমান করে তিনি লিখলেন 'বেদান্তসার' নামে আর একখানা সহজ বই ; এর হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রচার করেছিলেন। বছর দুই বাদে রামমোহন একে একে প্রকাশ করলেন পাঁচখানা উপনিষদ—সঙ্গে বাংলা অনুবাদ। রামমোহন এইসব বই নিজের টাকায় ছাপিয়ে বিতরণ করতেন, বিক্রী করতেননা। এইসব মহৎ কাজ করতেন বলেই না তিনি চাকরি করে অত টাকা জমিয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি তাঁর 'তুহফাৎ' বইটিও প্রকাশ করেন।

এই বইটিতে তিনি লিখলেন, 'সকল দেশের লোকেরা একটা বিষয়ে একমত যে, এই জগতে সব কিছুর আদি কারণ ও তার নিয়ন্তারূপে একজন বিদ্যমান আছেন। সকল ধর্মেই যখন বিশেষ অমূলক মত ও নানারকমের বাহ্য অনুষ্ঠান রয়েছে, তখন সকল ধর্মেই অসত্য বর্তমান। তাই মানুষের পক্ষে প্রথম দরকার কোনটা সত্য আর কোনটা সত্য নয় তা নির্ণয় করা। সত্যের অনুসন্ধান করাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ

কাজ, একমাত্র ধর্ম। কিন্তু মানুষ তা করে কোথায়? যুক্তিশূন্য মত আর অলৌকিকতা সকল ধর্মেই ন্যায় ও সত্যকে ঢেকে রেখেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নেতারা তাদের নাম-যশ বাড়াবার জন্য যা খাঁটি সত্য তাকে বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাখেন। এইসব ধর্ম প্রবর্তকেরা মানুষের স্বাভাবিক বিচারশক্তি ও বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। এরা বলতে চান যে, ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের কোন স্থান নেই ; বলতে চান যে, ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। এইসব গুরুদের প্রভাব শিষ্যদের ওপর এতই গভীর যে, তারা গুরুদের কথামত এক টুকরো পাথর অথবা একটি উদ্ভিদ বা জন্তু জানোয়ারকেই ভগবান বলে মনে করে। এমনি করেই যা প্রকৃত ধর্ম এবং সত্য তা বিকৃত হয়ে গেছে।'

রামমোহনের 'তুহ্‌ফাৎ' বইটি একেশ্বরবাদের জয়গানে মুখর।

শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশ নয়, মানুষেরই রচনা ; ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা মানুষের সহজ দৃষ্টিকে আবিল করে দেয়, মানুষের মঙ্গল চিন্তাই ঈশ্বর উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ—এইসব কথা তিনি সাহস করে বলেছিলেন বলেই তো এক শ্রেণীর লোক রামমোহনকে নাস্তিক ও পাষণ্ড এবং হিন্দুধর্মের নতুন 'কালাপাহাড়' বলে রীতিমত উপহাস করেছিল। এজন্য অবশ্য রামমোহনের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের পথেই দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের চিন্তায় ও ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গল চিন্তাকে সকলের আগে স্থান দিয়ে তিনি নবযুগের উদ্বোধন করেছিলেন। অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন থেকে তিনিই তো তাঁর স্বদেশবাসীকে মুক্ত করে উদার মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। এইভাবেই তো রামমোহনের চিন্তা ভাবনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল উনিশ শতকের নব জাগরণ। জ্ঞান, বিবেক ও বিচারশক্তির মশাল জ্বেলে, সত্যের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে, একা রামমোহন এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। জাতি তাই তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এই সময়ে অনেক পণ্ডিত রামমোহনকে বিচার ও তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। রামমোহন এটাই চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন একটা ঘুমন্ত জাতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটুক, নিশ্চিন্ত আলস্যের শয্যা থেকে সে একবার দাঁড়াক। তাই তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন। দেশময় তখন তাঁর প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল—ছড়িয়ে পড়েছিল সাগরপারেও। এইবার যুদ্ধে নামতে হলো তাঁকে—সে যুদ্ধ ছিল মুখে ও কলমে। এই রকম দুটি বিচার-যুদ্ধের ঘটনা বলি। এর একটি হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে, অপরটি সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে।

কলকাতায় রামমোহনের প্রতিপক্ষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তখনকার দিনের একজন অসাধারণ পণ্ডিত, ষড়দর্শনে সুপণ্ডিত। বয়সে ইনি রামমোহনের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। রামমোহন যখন কলকাতায় এসে সংস্কার কাজে ব্রতী হলেন, তখন এখানকার সমাজে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। ইংরেজ পাদ্রীরা পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন পণ্ডিত ছিলেন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরও একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন মৃত্যুঞ্জয়কে আকৃষ্ট করল। রামমোহনের বইগুলো তিনি পড়লেন এবং নিজেও 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে একখানা বই লিখলেন। এর একটি ইংরেজী অনুবাদ করেন ম্যাকনটন নামে একজন ইংরেজ। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' পাঠ করে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। সেই বই একখানি রামমোহনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিমাপূজা বিষয়ে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছাও জানিয়েছিলেন।

মানিকতলায় রামমোহনের বাড়িতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একদিন যখন এলেন, তখন রামমোহন স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মানীর মান রাখতে তিনি জানতেন। সে স্মরণীয় তর্কযুদ্ধ দেখবার জন্য রামমোহনের বাড়িতে শহরের অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন।

দু'জনাই তাঁদের তূণ থেকে বাছা-বাছা বাণ নিক্ষেপ করে প্রতিমাপূজার অসারতা ও সার্থকতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। নানাশাস্ত্র থেকে শ্লোক তুলে চুল-চেরা বিচার হয়। দুই পক্ষই প্রবল—দু'জনেই সমান পণ্ডিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়কে বিচারে পরাস্ত করেন রামমোহন তাঁর শাণিত যুক্তির সাহায্যে।

শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারের ঘটনাটি এইরকম।

১৮১৯ সাল।

ডিসেম্বর মাস।

বড়বাজারের বিহারীলাল চৌবের বাড়ি। মাদ্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রীমশাই তখন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত। কলকাতায় এত বড় বিচারসভা এর আগে আর কখনো বসে নি। রাধাকান্ত দেব থেকে আরম্ভ করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অনেক গণ্যমান্য প্রতিনিধি সেদিন এই স্মরণীয় তর্কযুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন। চৌবের বাড়ির উঠানে বিরাট সামিয়ানার তলায় এই বিচার সভা বসেছিল। রামমোহন এলেন। শালপ্রাংশু মহাভুজ, সেই দীর্ঘ উন্নত দেহ, মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি, অতি পরিচ্ছন্ন রাজকীয় পরিচ্ছদ। রামমোহন সভায় এলেন। সঙ্গে কয়েকজন অনুরাগী। তুমুল তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হলো। উনিশ শতকের কলকাতায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা। শাস্ত্রী বললেন, যারা বেদ পড়েনি তাদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নেই। রামমোহন উত্তর দিলেন চারটি ভাষায়—সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে। রামমোহনের অকাট্য যুক্তি আর শাস্ত্রীয় প্রমাণের সামনে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর পাণ্ডিত্য কোথায় ভেসে গেল, তিনি নির্বাক হয়ে মাথা নীচু করে পরাজয় স্বীকার করলেন। এইভাবে প্রতিমা-পূজা বা সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার পক্ষে রামমোহনকে অনেক বিতর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। পণ্ডিত, গোস্বামী, ভট্টাচার্য ও পাদ্রী—সকলের সঙ্গে তাঁকে বিচারযুদ্ধে বসতে হয়েছিল।

সর্বত্রই একা রামমোহন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে তাঁর একেশ্বরবাদের জয় পতাকা উড়িয়েছিলেন।

এসব কাজ করতে তাঁকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে হতো তা, আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে, আমরা সহজে ধারণা করতে পারব না। এই সময় তিনি যেসব বই লিখেছিলেন সেগুলো আকারে যদিও ছোট ছিল, কিন্তু তাতে প্রমাণ দেবার জন্য যেসব শাস্ত্রীয় বচন তিনি উদ্ধৃত করে দিতেন, সে সব সংগ্রহ করতে কম পরিশ্রম করতে হতো? এজন্য তাঁকে রাশি রাশি বই পড়তে হতো, তার মানে বুঝতে হতো। তাঁর মানিকতলার বাড়িতে তিনি রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত একাগ্রমনে শাস্ত্র পাঠ করতেন, বই লিখতেন।

রামমোহনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ রামমোহন-প্রচারিত একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তখন যে সব বই লেখা হয়েছিল ; সে সব প্রত্যেকটি বইয়ের জবাব দিতে হতো রামমোহনকে। এইভাবে একদিকে প্রকাশ্য বাগ-যুদ্ধ, অপরদিকে মসীযুদ্ধে তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। এইভাবেই তিনি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের কবল থেকে শাস্ত্রকে মুক্ত করে সকলের জন্য পরমার্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ খুলে দিয়েছিলেন। ধর্ম বা শাস্ত্র বামুনদের একচেটিয়া জিনিস নয়—এতে শূদ্রের অধিকার আছে, মেয়েদেরও সমান অধিকার আছে ; অধিকার আছে, সকল বর্ণের মানুষের। চারিদিকের হিন্দুসমাজের নির্যাতন ও নিন্দা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। এরই মধ্যে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে যুগমানব রামমোহন একটা নতুন যুগের পত্তন করেছিলেন। তাঁর মানিকতলার সেই বাড়িতে সেদিন সত্যিই নবযুগ গঠনের এক বিরাট যজ্ঞশালা বসেছিল। সেই যজ্ঞশালায় তিনি একাই ছিলেন হোতা, উদগাতা ও ঋত্বিক। আর তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হতো শুধু একটি মন্ত্র :

'ওঁ প্রণায় স্বাহা'।

ছয়

আত্মীয়সভায় শুধু ধর্মের কথা আলোচনা হতো না। এখানে যাঁরা আসতেন এবং যাঁরা রামমোহনের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে রামমোহন বলতেন, দেশ যে অজ্ঞতা আর অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। নতুন যুগ এসেছে, এখন ইংরেজী শিক্ষার দরকার আমাদের। ওদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে, ইংরেজী ভাষা না শিখলে তার পরিচয় আমাদের দেশের লোক পাবে কি করে? ধর্মের আলোই যথেষ্ট নয়, শিক্ষার আলোও দরকার।

তাঁর এই কথায় সকলেই সায় দিলেন। চেতনার মশাল জ্বালিয়ে রামমোহন অগ্রসর হলেন।

কলকাতায় এসে রামমোহন শিক্ষাবিস্তারের কথাও চিন্তা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা এমন জাগ্রত ছিল যে, একেশ্বরবাদ প্রচারের সঙ্গে এটাও তাঁর ধ্যান-ধারণার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, এই অধঃপতিত জাতিকে আপন মর্যাদায় স্থাপন করতে হলে তাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। তখন দেশে কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হয়েছে। এক দল চাইছিল, দেশে সংস্কৃত

ও ফারসী ভাষার প্রচলন হোক। অপর দল ছিল ইংরেজীর পক্ষে। রামমোহন নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, অথচ তিনিই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে লিখলেন—এই শিক্ষা ভারতকে অজ্ঞানতায় ডুবিয়ে রাখবে। নতুন যুগ এসে গিয়েছে। এখন সাবেক কালের টোল, চতুষ্পাঠী বা মক্তব মাদ্রাসা দিয়ে চলবে না। আরো বললেন, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার গণ্ডীর মধ্যে থাকলে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইংলণ্ডের মত সু-উন্নত হতে পারবে না। ইংরেজী শিক্ষা ভিন্ন এদেশের উন্নতি নেই।

তখন আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল শাসকজাতির স্বার্থে, এদেশের লোকদের স্বার্থে নয়। তখনো পর্যন্ত শাসকের শিক্ষানীতি গড়ে ওঠেনি—জনসাধারণের শিক্ষার কথা তাঁরা চিন্তা করে দেখেননি। বেসরকারী ভাবে খ্রীস্টান পাদ্রীরা দেশের এখানে ওখানে অল্প-স্বল্প ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা ছিল এর ভিতর দিয়ে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা। শহর কলকাতায় দুটো ইংরেজী স্কুল, তার একটা ছিল শরবোরন সাহেবের, অপরটা স্থাপন করেন আরাটুন পিত্রুস। নামেই স্কুল,আসলে তাঁদের নিজের নিজের বাড়িতেই ছাত্ররা এসে ইংরেজী শিখত। পরে হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হলেন—স্থাপন করলেন নিজের খরচে হেয়ার স্কুল দেশীপাড়ায়। হেয়ার সাহেবই হিন্দু কলেজ স্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন। কলকাতায় আসবার কিছুকাল পরেই রামমোহন ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

হিন্দু কলেজ (এখনকার নাম প্রেসিডেন্সী কলেজ) কেমন করে স্থাপিত হয়েছিল সেই ইতিহাস একটু বলি।

হেয়ার সাহেব প্রথমে রামমোহনের কাছে একদিন প্রস্তাব করলেন—

ভাল প্রণালীতে একটা বড় রকমের ইংরেজী স্কুল করলে কেমন হয়?

—উত্তম কথা, আমিও সেই কথা ভাবছি। বললেন রামমোহন।

তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার জন হাইড ঈস্ট। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর কাছে গিয়ে শহরে একটা ভালরকম ইংরেজী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি সেই প্রস্তাব আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করলেন।

১৮১৬ সাল, ১৪ মে

বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ।

ঐদিন বিচারপতি হাইড ঈস্ট ও ডেভিড হেয়ার শহরের প্রধান নাগরিকদের একটা সভা ডাকলেন। কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রামমোহনও উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতির বাড়িতেই সভা হয়েছিল। প্রথম দফায় চাঁদা উঠেছিল একলাখ টাকার কিছু বেশী। ১৮১৭ সালে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে মাত্র কুড়িজন ছাত্র নিয়ে স্কুল খোলা হলো। নাম দেওয়া হয়—হিন্দু স্কুল। এই স্কুলই পরে হিন্দু কলেজে পরিণত হয়। গরাণহাটা থেকে জোড়াসাঁকো, সেখান থেকে টেরেটি বাজার। এইভাবে জায়গা বদলাতে বদলাতে ১৮২৪ সালে স্কুল গোল দীঘির ধারে নিজস্ব বাড়িতে উঠে এলো।

ঐ একই সময়ে রামমোহন নিজে উদ্যোগী হয়ে 'য়্যাংলো হিন্দু স্কুল, নাম দিয়ে একটা অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নিজেই এই স্কুলের সমস্ত খরচ চালাতেন। ছেলেরা এখানে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করত। হেদুয়ার উত্তর দিকে একটা জমির ওপর স্কুলের নিজস্ব বাড়ি রামমোহন নিজের খরচে তৈরী করে দেন ১৮২২ সালে। তাঁর এই স্কুলে প্রায় একশ' জন হিন্দু ছাত্র পড়ত। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর প্রধান অনুগামী ও বন্ধু দ্বারকানাথের বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কথিত আছে, রামমোহন বালক দেবেন্দ্রনাথকে নিজের গাড়ি করে স্কুলে নিয়ে যেতেন।

১৮২৩ সাল। ১১ ডিসেম্বর।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। কোম্পানীর সরকার সেই প্রথম ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু কিরকম ধরনের শিক্ষা এদেশের উপযোগী হবে, সেটা তখনো পর্যন্ত ঠিক হয় নি। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হলো। চারদিকে তুমুল বিতর্ক— ইংরেজী, না সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী? একদল লোক বলল শুধু সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক; অপর দল ইংরেজীর পক্ষপাতী— কারণ ইংরেজী ছাড়া পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখবার রাস্তা নেই। এই দলের নেতা ছিলেন রামমোহন।

লর্ড আমহার্স্ট তখন গভর্নর-জেনারেল।

দুইপক্ষে তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে।

সরকার প্রাচীনপন্থীদের মত অনুসরণ করতে চাইলেন। রামমোহন এই খবর পেলেন। এত টাকা কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য খরচ হবে? দেশের লোক ইংরেজী শিখতে পাবে না? এইসব চিন্তা করে রামমোহন কলম ধরলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে ভারতবর্ষকে তিনি আর পড়ে থাকতে দেবেন না। তিনি লর্ড আমহার্স্টকে একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলেন। তিনি যদি এই চিঠিখানা না লিখতেন তা'হলে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার অত তাড়াতাড়ি হতে পারত কিনা সন্দেহ। তাঁর এই চিঠিখানাই তো কোম্পানীর শিক্ষানীতি ঠিক করে দিয়েছিল এবং ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সূচনা করে দিয়েছিল। এই একটিমাত্র কাজের জন্য রামমোহন অমর হয়ে আছেন।

রামমোহন তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন যে একটা নতুন যুগের সূর্যোদয় আসন্ন হয়ে উঠেছে এই দেশে। সেই যুগের ভাষা ইংরেজী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। বুঝেছিলেন যে, দেশের সকল স্তরে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বেড়ে চলেছে; ব্যক্তিগত

উদ্যোগে এখানে-ওখানে যেসব ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছে সেইগুলি জনসাধারণের উৎসাহ আর আগ্রহে ভালোভাবেই চলছে। সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন না অথবা সংস্কৃত ভাষার যে কোন দাম নেই, এমন কথা তিনি বলেন নি। তাঁর বলবার কথা ছিল যে, বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষায় দেশের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হলে ইংরেজী ভাষাকেও এখন প্রাধান্য দিতে হবে।

১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে রামমোহন যে সুদীর্ঘ চিঠিখানা লিখেছেন তার মূল বক্তব্য ছিল এই রকম—দেশের প্রকৃত উন্নতি যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাই উচিত। এই চিঠিতে তিনি সরকারী নীতির সমালোচনা করে বলেন যে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তা এদেশে অনেক দিন থেকেই আছে। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে, তা পুরোপুরি আয়ত্ত করার জন্য প্রায় সারা জীবন কেটে যায়। সরকারের যদি ধারণা হয় যে, এদেশের অনেক অমূল্য সম্পদের সন্ধান এই ভাষায় লেখা আছে বলে এই ভাষা জানা দরকার, তাহলেও নতুন সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। এদেশে অনেক পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনে নিযুক্ত আছেন এবং এঁদেরই উৎসাহ ও সাহায্য দিলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষাখাতে যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার সবটাই সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খরচ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। সরকার যদি এদেশের জনসাধারণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে অবশ্য এই ব্যবস্থাই ঠিক, কিন্তু তা যখন নয়, তখন ইংরেজী শিক্ষা চালু করাই উচিত। চিঠির শেষে তিনি এদেশীয় যুবকদের ঠিকমত শিক্ষিত করে তোলার জন্য পাঠ্যতালিকায় কি কি বিষয় থাকবে তাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তিনি লিখেছিলেনঃ এই নতুন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী হবে উদার ও সংস্কৃতিসম্পন্ন: পাঠ্যতালিকায় থাকবে গণিত, রসায়ন, শরীরবিদ্যা ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় বিষয় ; শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করতে হবে য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রকৃত বিদ্বানকে, আর থাকবে দরকারী বই ও যন্ত্রপাতি।

রামমোহন এই চিঠি লিখেছিলেন সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে, কিন্তু তাতে সই ছিল শুধু তাঁর। বিশপ হেবেরের হাত দিয়ে তিনি এই চিঠিখানা গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জনমত সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপক্ষে। তাই সরকার রামমোহনের এই আবেদন তখনি গ্রাহ্য করলেন না। তবে তাঁর এই ঐতিহাসিক চিঠি নিয়ে সরকারী মহলেও তুমুল আলোড়ন জেগেছিল, বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরের সভায় পর্যন্ত এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বারো বছর বাদে রামমোহনের উদ্দেশ্য সফল হয়। তখন ইংলণ্ডের মহাসভায় এক নতুন দলের উদ্ভব হয়—ইংলিশ পার্টি। এঁরা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। তখন এখানে গভর্নর-জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, আর লর্ড মেকলে তাঁর আইন সদস্য। মেকলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে রায় দিলেন। এ ঘটনা ১৮৩৫ সালের। রামমোহন তখন আর বেঁচে নেই। রামমোহন না থাকলেও তাঁর আবেদন ছিল, তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। এসবের প্রভাব গিয়ে পড়েছিল মেকলের ওপর। তাইতো তিনি ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনে রায় দিয়েছিলেন।

এখানে আর একটি কথা বলার আছে। ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। এই কলেজ স্থাপনের জন্য যে কমিটি হয়েছিল, রামমোহন তার একজন সভ্য ছিলেন। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরোধী, হিন্দু সভ্যগণ এই কারণ দেখিয়ে কমিটি থেকে সরে যেতে চাইলেন। রামমোহনের কাছে আদর্শই ছিল বড়, ব্যক্তিগত মর্যাদা তাঁর কাছে তেমন বড় ছিল না। এমন একটা জনহিতকর উদ্যমের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত থাকলে উদ্যম পণ্ড হবে—এটা তিনি চাইলেন না। তিনি তখনি সভ্যপদ ত্যাগ করলেন। যখন ডেভিড হেয়ার এসে তাঁকে

এই কথা বলেন, তখন তিনি হেয়ার সাহেবকে বলেছিলেন, 'আমি কমিটিতে থাকলে যদি কলেজের লেশমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে আমি সে সম্মানের কাঙাল নই।' এমনি উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন রামমোহন। তিনি সব সময় দেশের কল্যাণ চাইতেন, নিজের যশগৌরব তুচ্ছ মনে করতেন।

এর ছ'বছর পরের একটি ঘটনা।

রামমোহনের আহ্বানে স্কচ্ মিশনারী আলেকজান্দার ডাফ এলেন কলকাতায়। তিনি স্কটল্যাণ্ড মিশনের পাদ্রী। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে হেয়ার সাহেবের সঙ্গে এই ডাফ সাহেবের নামও স্মরণ করতে হয়। যদিও তিনি এসেছিলেন খ্রীস্টধর্মের একজন প্রচারক হয়ে, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্যেও তিনি যথেষ্ট করেছেন। তখনকার দিনে হিন্দু পাড়ায় একটা মিশনারী স্কুল খোলা বড় সোজা ছিল না। সকলেই এর বিরোধিতা করতো। তাই স্কুল খুলতে গিয়ে ডাফ সাহেবকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলো। একটা বাড়ি পর্যন্ত তিনি ভাড়া পেলেন না। ডাফ তখন রামমোহনের শরণাপন্ন হলেন। ইংরেজী স্কুল হবে শুনে রামমোহন ডাফকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিমি ডাফের স্কুল বসাবার ভার নিজে নিলেন। বছর দুই আগে যে বাড়িতে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেছিলেন সেই কমল বসুর বাড়ি তিনি ঠিক করে দিলেন।

ডাফ সাহেব সেই বাড়িতে স্কুল খুললেন।

স্কুল তো খোলা হলো, ছাত্র কই? পাদ্রীর স্কুলে কোন হিন্দু অভিভাবক ছেলে পাঠাতে সাহস করলেন না। কি জানি যদি ভুলিয়ে খ্রীস্টান করে। তখন রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের পরিবার থেকে ছ'জন ছাত্র যোগাড় করে দিলেন। স্কুল খুলবার দিন নিজে উপস্থিত থেকে ছেলেদের উৎসাহ দিলেন। তাদের বললেন—তোমরা ভাল করে ইংরেজী শেখ, তাহলে ওদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখতে পারবে। তিনি প্রায়ই ডাফের স্কুল পরিদর্শন করতে আসতেন ও তাঁকে পরামর্শও

দিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুল জমে উঠল, ছাত্রের সংখ্যাও বাড়ল। ডাফ সাহেব তখন স্কুল চিৎপুর থেকে হেদুয়ার কাছে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। ডাফের স্কুলের নাম ছিল 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন।' স্বামী বিবেকানন্দ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

ডাফ সাহেবের স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল বিলি করা হতো। ফলে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিভাবকরাও ভয় পেলেন। তবে কি ডাফ সাহেব তাঁদের ছেলেদের খ্রীষ্টান করবার মতলবে আছেন? অভিভাবকদের অনেকেই রামমোহনের বন্ধু অথবা বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। রামমোহনের কথাতেই তাঁরা ডাফ সাহেবের স্কুলে ছেলে পাঠিয়েছেন। রামমোহন একদিন স্কুলে এলেন। সেদিন তিনি কয়েকজন অভিভাবকদের উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। ছাত্র ও অভিভাবদের বুঝিয়ে বললেন—'বাইবেল পড়লেই লোক খ্রীষ্টান হয় না। উইলসন সাহেব আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কত পড়েছেন ; তাই বলে কি তিনি হিন্দু হয়ে গিয়েছেন ? আমি তো অনেক বার কোরান পড়েছি ; কই আমি তো মুসলমান হই নি। আমি সমস্ত বাইবেল যত্নের সঙ্গে পড়েছি। তবু আমি খ্রীষ্টান হইনি, এই যে আমার গলায় পৈতা পর্যন্ত রয়েছে। তোমরা বাইবেল পড়তে ভয় পাও কেন ? অন্য ধর্মের সঙ্গে তোমাদের ধর্মের তফাৎই বা কোথায় ও কতটুকু সেটা বুঝতে হলে সে সব ধর্মের শাস্ত্র পড়তে হয়।'

নব জাগরণের পক্ষে এমনি উদার চিন্তার সেদিন প্রয়োজন ছিল।

তাঁর মানিকতলার বাড়িতে রামমোহন বেদ পড়াবার জন্য একটা স্কুল খুলেছিলেন। এই স্কুলে হিন্দু একেশ্বরবাদ প্রচার করবার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হোত। রামমোহন বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি বেদান্ত দর্শন মানতেন। মানতেন বলেই বাংলায় এর ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। সাধারণত বেদান্তের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত

ছিল—যার মূল কথা, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এই ব্যাখ্যা আচার্য শঙ্কর দিয়েছিলেন। রামমোহন তার বিরোধী ছিলেন। তিনি সকল জিনিসের ব্যবহারিক সত্য স্বীকার করতেন, জাগতিক কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম, নৈতিক দায়িত্ব—এসব বিশ্বাস করতেন। এইখানেই তিনি আধুনিক। আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন বলেই তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন।

সাত

গঙ্গার তীরে চিতা সাজানো হয়েছে।

এক সন্তবিধবাকে আলতা-সিঁদুরে সাজিয়ে তোলা হলো সেই চিতায়।

মৃত স্বামীর পাশে-হাত-পা-মুখ বেঁধে রাখা হলো তার স্ত্রীকে।

চিতায় আগুন দেওয়া হলে ; চিতা জ্বলে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে কাঁসর ঘণ্টা আর হাজার কণ্ঠে হরিধ্বনি।

সেই পৈশাচিক উল্লাসে চাপা পড়ে যায় এক অসহায় সন্তবিধবার বেঁচে থাকার অন্তিম প্রার্থনা। এমন কি বাঁশের লাঠির নির্দয় প্রহারে দূর হয়ে যেত তার সকল যন্ত্রণা। সেই চিতার আগুনে শুধু এক অসহায় নারী পুড়ে মরত না, তার সঙ্গে প্রত্যেক বার নতুন করে পুড়ত হিন্দুর মনুষ্যত্ব।

এই অমানুষিক প্রথার নাম সতীদাহ বা সহমরণ। শুধু বাংলায় নয়, একদিন এই প্রথা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। মৃত পতির সঙ্গে তার বিধবা পত্নীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার এই বর্বর প্রথা অনেককাল থেকেই এদেশে চলে আসছিল। এই সতীদাহ প্রথাকে

কেন্দ্র করে রামমোহন যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তা-ই তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি হয়ে আছে। হিন্দু সমাজে নারীজাতির অবস্থা যে কি রকম শোচনীয় তা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। পুরুষপ্রধান হিন্দু সমাজে মেয়েদের নিজস্ব কোন সত্তা ছিল না। স্বামীর চিতার ওপরেই তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হতো না, সমস্ত জীবনই তাকে পুরুষপ্রধান সমাজের অত্যাচারে জ্বলে পুড়ে মরতে হতো। নানা রকম প্রথার চাপে তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠত। নারীদের দুঃখ বিমোচন করতে সেদিন তাই একা রামমোহনকে এগিয়ে আসতে হলো।

আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম সমাজ-সংস্কারক রামমোহন।

সতীদাহ নিবারণ তাঁর সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন।

একালের ভারতবর্ষে এটাই ছিল প্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন।

রামমোহনের এই আন্দোলনের ফলেই ভারতবাসী সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিল। সতীদাহের মতো এদেশে আর একটা পৈশাচিক প্রথা ছিল। সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়া। ১৮০২ সালের আইনে এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সতীদাহ প্রথা তখনো পর্যন্ত উঠে যায় নি। কোম্পানী এ সম্পর্কে গোড়ার দিকে বিশেষ কোন চিন্তা করেনি। তবে এই কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে লোকমত গঠন করেছিলেন শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা। কেরী সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। একাজের জন্য তাঁরা আমাদের প্রশংসার পাত্র হয়ে আছেন।

কেরীসাহেব এই প্রথা নিয়ে হিন্দু সমাজের যাঁরা মাথা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন, অন্যদিকে কোম্পানীর সরকারের দৃষ্টিও তিনি এই প্রথাটির দিকে অকর্ষণ করেন। ধর্মের নামে সমাজের যূপকাষ্ঠে যেসব স্ত্রীলোকদের এইভাবে বলি দেওয়া হতো তাদের সম্পর্কে পাদ্রীরা অনেক দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত এই তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮০৩ সালে এক বাংলা

দেশেই একবছরে সতীদাহের সংখ্যা ছিল চারশ'রও বেশি। এছাড়া, কেরী সাহেব আরো একটা কাজ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সাহায্যে হিন্দু শাস্ত্রে যে সব জায়গায় সহমরণের কথা লেখা আছে, সেইসব অংশগুলি তিনি সংগ্রহ করে, কাউন্সিলের সভ্য মিস্টার উডনীর হাতে দেন। তিনি এই সব তথ্যের ভিত্তিতে একটা আবেদন তৈরী করে লর্ড ওয়েলেসলী ও সুপ্রীম কোর্টের কাছে পেশ করেন।

তখন কোম্পানীর সরকারের টনক নড়ল।

তাঁরা সতীদাহ প্রথার নৃশংসতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু কাজ বেশি দূর এগোলো না। সহমরণের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আইন করে এই প্রথা উঠিয়ে দিলে লোক মনে করবে তাদের ধর্মে সরকার বুঝি হস্তক্ষেপ করছে। এইভাবে কেটে গেল ১৮১৮ সাল পর্যন্ত। সরকার যে সতীদাহ প্রথারউচ্ছেদ চায় না, এটা তখন সহজেই বোঝা গেছে। তাই সেদিন এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য একমাত্র পথ ছিল জনমত গঠন। আর সেই জনমতের চাপে সরকারকে এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা। কিন্তু সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সেদিন সহজ ছিল না। সকল বর্ণের হিন্দু যখন এর সপক্ষে, তখন সেই সমুদ্রপ্রমাণ বিরোধিতার সামনে দাঁড়াবে কে? কার এমন বুকের পাটা আছে? কার আছে শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা? শুধু শক্তি ও সাহস থাকলে হবে না, তার সঙ্গে দরকার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান।

এমন মানুষ—এমন যোগ্য মানুষ দেশে তখন একজনই ছিলেন।

তিনি রামমোহন রায়। এগিয়ে এলেন তিনি। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। অমানুষিক পরিশ্রম করলেন, বিরাট আন্দোলন শুরু করলেন। তবেই না হিন্দু সমাজের বুক থেকে এই বিভীষিকার অবসান ঘটেছিল। আজ তাই রামমোহন ও সতীদাহ প্রথা-বিচ্ছেদ—এই দুটি কথা আমরা একই সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি।

সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস এইবার বলছি। এ ইতিহাস না জানলে রামমোহনের প্রকৃত মহত্ব বোঝা যাবে না।

যদিও ১৮১৮ সালে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তবুও এর অনেক আগে থেকেই রামমোহন এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। আগেই বলেছি, আত্মীয়সভার মঞ্চ থেকে তিনি শুধু ধর্মের কথা-ই আলোচনা করতেন না, সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যার কথাও সেখানে আলোচিত হতো। যখন তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ করেন তখনো এই কুপ্রথাটির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। আত্মীয়সভায় প্রায় অধিবেশনে তিনি সভ্যদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতেন। আত্মীয়সভার সম্পাদক ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাম দিয়ে ১৮১৮ সালের গোড়ার দিকে রামমোহন সতীদাহের বিরোধিতা করে বাংলা ও ইংরেজীতে একটা ছোট্ট বই লেখেন এবং সেটি কলকাতায় ও তার আশেপাশে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন আদালতে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পণ্ডিতদের কাছেও পৌছে দেওয়া হয়।

এই বইটি বেরুবামাত্র সতীদাহের সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় কলগুঞ্জন এবং তার থেকে আলোড়ন। তাঁরা এর উত্তর দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তারপরেই সব চুপচাপ। রামমোহনের বইটিকে সমর্থন ও স্বাগত জানিয়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বেরুল একখানা চিঠি। তাকে বলা হলো, বিষয়টির রীতিমত অনুসন্ধান হওয়া দরকার। তবুও সমর্থকদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর এলো না। এদিকে সতীদাহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের কান্নায় বাংলার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। তাই রামমোহনের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। জ্বলন্ত চিতার ওপর থেকে নির্যাতিতা নারীর ক্রন্দন যেন তাঁর কানে ভেসে এলো। মনে পড়ল, তিনি যখন রংপুরে ডিগবির অধীনে কর্মরত তখন তাঁর অগ্রজের স্ত্রী অলকমঞ্জরীকে জোর

করে মৃত স্বামীর চিতায় তোলা হয়েছিল। সেই সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন রাধানগরে। তখনই তো তিনি শপথ নিয়েছিলেন—এই নৃশংস প্রথা যেমন করে হোক হিন্দু সমাজের বুক থেকে তিনি উচ্ছেদ করবেনই।

রামমোহনের শপথ যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

১৮১৮ সালের শেষভাগে বেরুল সহমরণ বিষয়ে তাঁর প্রথম পুস্তিকা। প্রশ্নোত্তরে লেখা। এর একটা ইংরেজী অনুবাদও বেরুলো কয়েক সপ্তাহ পরে। সতীদাহ সম্পর্কে ইংরেজদের মনে একটা ধারণা ছিল যে, হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রথার অনুমোদন আছে। সম্ভবত এই জন্যই সরকারের পক্ষ থেকে এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয়নি রামমোহন এই ভুল ভেঙে দিলেন। রামমোহন অসামান্য যুক্তির সঙ্গে এই কাল্পনিক কথোপকথনের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, এই নিষ্ঠুর প্রথার সপক্ষে বামুনেরা যতই শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিক না কেন আসলে এক অমূলক লৌকিক আশঙ্কাই দেশব্যাপী এতবড় নিষ্ঠুরতার মূল কারণ। যথার্থ বিচার করলে শাস্ত্রে এর বিষয় কিছু পাওয়া যায় না।

আলোড়ন জাগল হিন্দু সমাজে। পাল্টা বই বেরুল সমর্থকদের পক্ষ থেকে। এর লেখক ছিলেন কাশীনাথ তর্কবাগীশ। তার জবাবে ১৮১৯ সালের শেষের দিকে রামমোহন বের করলেন দু'নম্বর পুস্তিকা। প্রথার সমর্থকদের পক্ষ নিয়ে কাশীনাথ নিজের সুবিধা অনুসারে শাস্ত্র বাক্যের যে অর্থ করেছেন, রামমোহন এই দ্বিতীয় পুস্তিকায় ঐ একই ভাবে (কথোপকথনের মধ্য দিয়ে) একে একে তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেন। শুধু ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান নয়, তর্কশাস্ত্রের উপর তার অতুলনীয় অধিকার ছিল। এই বই দুটি তার পরিচয় বহন করে। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের দুর্ভাগ্যের কথা যে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তিনি লিখেছেন তার তুলনা মেলে না। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, সমস্ত দরদ উজাড় করে তিনি

এই বই দুটি রচনা করেছিলেন। আকারে ছোট কিন্তু অনুভূতিতে সুগভীর। নিপীড়িত নারী জাতির দুঃখ দুর্দশার যে করুণ চিত্র সেদিন তিনি এঁকেছিলেন তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি বাস্তব। এইভাবে একা রামমোহন সমাজের সর্বত্র অবহেলিত মেয়েদের প্রতি একটা সর্বজনীন সহানুভূতি জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। মেয়েদের জন্য ঠিক এমনি করুণা, এমনি মমতা আর এমনি সহানুভূতি বাংলাদেশে দেখিয়েছিলেন আর একজন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিও তাঁর সময়ে দেশে ঠিক এই রকম এক আন্দোলন করেছিলেন। তার নাম বিধবা বিবাহ আন্দোলন। তাঁর জীবনী পাঠ করলে তোমরা এই আন্দোলনের কথা জানতে পারবে।

বাংলার সে যুগের নারী সমাজের দুঃখ দুর্দশায় রামমোহন এমন অস্থির হয়েছিলেন যে, তাঁর দ্বিতীয় বইটির ইংরেজী অনুবাদ যখন বেরুল তখন সেটি তিনি উৎসর্গ করলেন এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার নামে। তিনি গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর পত্নী। ভারতের সমস্ত নির্যাতিত স্ত্রীলোকের পক্ষ হয়ে রামমোহন আবেদন জানালেন আর একজন স্ত্রীলোকের সহানুভূতির দ্বারে। রামমোহন হয়ত ভেবেছিলেন যে, মেয়েদের ব্যথা মেয়েদের পক্ষে বোঝা সহজে হবে এবং হেষ্টিংস-পত্নীর সহানুভূতি জাগলে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সরকারী-ভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এত সহজে তা সম্ভব হলো না। রামমোহনকে আরো অনেক বছর—প্রায় নয় বছর—অপেক্ষা করতে হলো। ততদিনে চিতার আগুনে নির্মমভাবে পুড়ে ছাই হলো আরো কয়েক হাজার অসহায় নারীর জীবন।

রামমোহনের আন্দোলন চলতে থাকে।

নানাবিধ কাজের মধ্যে তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সমানভাবে তৎপর রইলেন। শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে তিনি প্রমাণ করলেন সতীদাহ একটা লোকাচার মাত্র—এর পেছনে শাস্ত্রের

কোন সমর্থন নেই। সমর্থকদের দল (এই দলের নেতা ছিলেন রাধাকান্ত দেব) হুঙ্কার ছাড়েন: আলবৎ, এ শাস্ত্রসম্মত। দুই পক্ষে চলে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ? এইভাবে বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে যখন আসর জমে উঠেছে তখন গভর্ণর জেনারেল হয়ে এদেশে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। ইনি আলাদা ধরনের লোক ছিলেন। বিলাতের মহাসভাতেও তখন সতীদাহ বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছিল—এ ছিল রামমোহনেরই আন্দোলনের ফল। পার্লামেন্টের অনেক সদস্য এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। সেসব খবর রামমোহন রাখতেন। তিনি দেখলেন শাস্ত্র দিয়ে কুলোবে না। কেননা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুবিধামত করা যায়। যুক্তির ধার কেউ ধারে না। রামমোহন তখন সরকারের দিকে তাকালেন। ঠিক সেই সময়ে এলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক।

ইনিও একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন।

এদেশে এসেই তিনি সমস্ত বিষয়টা জানলেন। শুনলেন রামমোহনের কথা, সতীদাহ বন্ধ করার জন্য তাঁর আন্দোলনের কথা। বেন্টিঙ্ক তাই সকলের আগে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। রামমোহন প্রথমে রাজী ছিলেন না, পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। বেলভেডিয়ারের সুরম্য লাট ভবনে এলেন রামমোহন। বেন্টিঙ্ক তাঁকে খুব শিষ্টাচার ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এই সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক ছিল। গভর্ণর জেনারেল রামমোহনের কাছ থেকে সতীদাহ বিষয়টির যথাযথ বিবরণ জানতে চাইলেন। তিনি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে আর যা যা বলা দরকার রামমোহন একে একে সবই বললেন। তাঁর লেখা সহমরণ-বিষয়ক বইগুলিও বেন্টিঙ্কের হাতে দিলেন। প্রবল যুক্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ আর তার সঙ্গে হৃদয়ের সহানুভূতি মিশিয়ে রামমোহন তাঁর বক্তব্য এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন যে, তা গভর্ণর জেনারেলের অন্তর স্পর্শ করেছিল।

—আপনি কি মনে করেন এ বিষয়ে আইন করলে কাজ হবে ?

—না, সরাসরি আইন পাশ করে এই প্রথা বন্ধ করার পক্ষপাতী নই। তাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে।

—তবে কিভাবে এটা বন্ধ হতে পারে ?

—পুলিশের সাহায্যে আর লোকমত গঠন করে। আমার সাধ্যমত শেষেরটা আমি করেছি।

বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করে বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্ত করলেন. আইন ছাড়া পথ নেই। তিনি তখন বিষয়টি কাউন্সিলে তুললেন।

আইন পাশ হলো।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখটি নব জাগরণের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রইল। হিন্দু সমাজের বুক থেকে যেন পাথরের একটা বোঝা নেমে গেল। গঙ্গার তীরে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় তার স্ত্রীকে আর পুড়ে মরতে হবে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠল। সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার একমাস পরে টাউন হলে রাম-মোহন গভর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দিত করলেন। তিনশো জন হিন্দুর সই-করা একটি অভিনন্দন-পত্র বেন্টিঙ্কের হাতে দেওয়া হয় ; এই অভিনন্দন পত্রে প্রথম সই ছিল রামমোহনের। এটি ইংরেজী ও বাংলায় লেখা ছিল। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলজনক একটা ঘটনা বলি।

টাউন হলের সভায় ইংরেজী অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন হরিহর দত্ত—ইনি হিন্দু কলেজের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন একজন। তিনি প্রকাশ্যে একটা বক্তৃতা দিয়ে সতীদাহ নিবারণ আইনে দেশের কল্যাণ হবে এমন মতও প্রকাশ করেছিলেন। এই খবরটি যখন তাঁর প্রাচীনপন্থী বাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি ছেলের ওপর শুধু রাগই করলেন না, তাকে বাড়িতে স্থান পর্যন্ত দিলেন না। গৃহ-বিতাড়িত যুবক মানিকতলায় রামমোহনের কাছে এসে তাঁকে সকল কথা জানালেন। রামমোহন একটু হেসে তাকে বললেন—'তোমার ও আমার একই দশা'। হরিহর দত্ত রামমোনের চিন্তা ও

মতে অনুগামী ছিলেন। তাই রামমোহন তার একটা ভাল চাকরি করে দিয়েছিলেন। অনুগামীদের বিপদে রামমোহন সব সময় সাহায্য করতেন, মুখে সহানুভূতি জানিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করতেন না।

রামমোহনের বেদনানুভূতি, বেন্টিঙ্কের সুবিবেচনা আর তার সঙ্গে মিলেছিল ইতিহাসের অভিপ্রায়। এরই ফলে সেদিন ধর্মের নামে এতকাল ধরে চলে আসা যে বর্বর প্রথাটির অবসান হলো—যে প্রথা রামমোহনের কথায় ছিল আত্মবলি ও নরবলি তাতে হিন্দু সমাজের সংরক্ষণশীল লোকরা খুশি তো হলেনই না; উপরন্তু তাঁদের নেতা রাধাকান্ত দেব এক হাজার হিন্দুর সই করা একটি প্রতিবাদ পত্র গভর্ণর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। এই আইন বাতিল করবার জন্য ধর্মসভার পক্ষ থেকে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলও করা হলো। সেই আপীলটি একজন ইংরেজ ব্যারিস্টারের মারফৎ পাঠান হয়েছিল। রামমোহন যেদিন বেন্টিঙ্ককে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন, তার পরের দিনই রাধাকান্ত দেবের টাকায় এই ধর্মসভার উদ্ভব হয়। এই সভার মঞ্চ থেকে তোপ দাগা হলো—রামমোহন বিধর্মী, রামমোহন কালাপাহাড়। প্রজার ধর্মে শাসক হস্তক্ষেপ করল, এ রাজত্ব টিকবে না—এই রকম প্রলাপ বচন ধর্মসভার পক্ষ থেকে প্রচার করা হলো। সতীদাহ-নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করা হয়েছে। এখন আমরা কি করব' ?—এই কথা যখন নন্দকিশোর বসু জিজ্ঞাসা করেন তখন এর উত্তরে রামমেহান শুধু একটি কথাই বলেছিলেন : 'সংগ্রাম ! আমি শিগ্‌গীর বিলাত যাচ্ছি।'

সতীদাহ-প্রথা উঠে গেল।

রামমোহন কিন্তু এখানেই থামলেন না।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, কৌলীন্য—এই সব প্রথা যেন নাগপাশের মতো বেঁধে রেখেছিল মেয়েদের জীবনকে। তাদের

দুর্গতির শেষ ছিল না। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল দুর্গতির অন্ধকারে। এরই মর্মস্পর্শী ছবি তিনি তুলে ধরেছিলেন সহমরণ-বিষয়ক বইয়ের এক জায়গায়। সেই প্রথম আমাদের দেশে মেয়েদের দুঃখ দুর্গতি ভাষায় রূপ পেলো। তাঁর নিজের পরিবারে বহু বিবাহ তিনি দেখেছেন, অল্পবয়সে তাঁকে এই প্রথার বলি হতে হয়েছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর মত এমন প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁর উইলে বলেছিলেন, তাঁর কোন ছেলে বা উত্তরাধিকারী একই সময়ে একটির বেশী দুটি বিয়ে করলে তাঁর সম্পত্তির কোন অংশ পাবে না। এই প্রথাটি বন্ধ করবার উদ্দেশ্য একটা আইন তৈরী করার জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শও দিয়েছিলেন।

বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকারের কথাও রামমোহন চিন্তা করেছিলেন। একেই বলে দায়াধিকার। তিনিই এদেশে এই সূচনা করেন, পরে এই প্রশ্ন তোলেন বিদ্যাসাগর। তাঁরা এইরকম চিন্তা-ভাবনা করে গিয়েছিলেন বলেই না আজ মেয়েরা তার সুফল ভোগ করছে। কন্যাপণের বিরুদ্ধে' কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধেও রামমোহন কলম চালিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশী করে তিনি চিন্তা করেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ারে বিষয়টা। এইভাবে পুরানো ঘুণধরা সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করে রামমোহন সকল দিক দিয়ে বাংলা তথা ভারতের সমস্ত নারীজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করে গিয়েছেন। এইভাবেই সেদিন, সেই ঘোর অন্ধকারের যুগে একাকী এই পুরুষসিংহ হিন্দু সমাজকে হাজার রকমের নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত করে গিয়েছেন।

আট

শিক্ষা ও ধর্মের সঙ্গে আরো একটা জিনিসের দরকার ছিল। রাজনৈতিক চেতনা। দেশের লোককে দেশের কথা, দেশের সমস্যার কথাও চিন্তা করতে হবে, রামমোহন এটাও বুঝেছিলেন। এরজন্য দরকার খবরের কাগজ। যা দরকার—ঘুমন্ত জাতিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে যা দরকার—তা করতে হবে। এই ছিল রামমোহনের ধরন-ধারন। তিনি বাংলা ও ফরাসী ভাষায় দু'খানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করলেন। উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। তারা যেন নিজেদের অধিকার, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। স্বজাতিপ্রীতি ও আত্মসচেতনা তাদের মধ্যে যেন গড়ে ওঠে।

এর জন্যেই দরকার খবরের কাগজ।

অন্যান্য দেশে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তাঁর জানা ছিল।

তাই এদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের জন্য রামমোহন এক অসাধ্যসাধন করলেন—সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু

করলেন। নবযুগজীবনকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন এইভাবে। প্রথমে বেরুলো বাংলা কাগজ, নাম দিলেন—'সংবাদ কৌমুদী'। চাঁদের কিরণের মতো বাঙালীর চিত্ত যাতে দেশ-বিদেশের সংবাদের আলোয় ঝলমল করে উঠতে পারে সেই ভেবেই তো এই সুন্দর নামটি দিলেন তিনি। সংবাদ কৌমুদী ছিল সর্বসাধারণের জন্য। একটু শিক্ষিত লোকের জন্য তিনি ফরাসী ভাষায় বের করলেন 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'। বিবিধ সংস্কার প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে স্বজাতির অন্তরে যে জাতিবোধের উন্মেষ করেছেন যে বিপ্লবের উদ্বোধন করেছেন, এইবার সেই বিপ্লবের গতিকে দুর্বার করে তুলবার জন্য রামমোহন 'কৌমুদী' আর 'মীরাৎ' বের করলেন।

১৮২১ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর।

'সংবাদ কৌমুদী' বেরুলো।

রামমোহন হাতে এক নতুন হাতিয়ার।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ছিল 'সমাচার দর্পণ'। এই কাগজে হিন্দুধর্ম বিরোধী প্রচারকার্য চালান হতো বেশি। সংবাদ কৌমুদীর কিছু আগে বেরিয়েছিল 'বেঙ্গল গেজেট' ; এর উদ্যোক্তা ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয় সভার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সময় কলকাতায় আরও একখানা ইংরেজী কাগজ বেরিয়েছিল ; এর নাম 'ক্যালকাটা জার্নাল'। এর সম্পাদক ছিলেন মি. জেমস সিল্ক বাকিংহাম। ইনি একজন নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর কাগজে যেমন সরকারী কাজকর্মের সমালোচনা থাকত, অন্যদিকে তেমনি এদেশীয় উন্নতি প্রচেষ্টার অকুণ্ঠ সমর্থনও থাকত। বাকিংহামের স্বাধীন উদার দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহনকে আকৃষ্ট করেছিল। রামমোহন যখন সংবাদ কৌমুদী বের করেন তখন তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ইংরেজদের মুখপত্র 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' পত্রিকায় এর ঠিক উল্টো সুর শোনা গিয়েছিল। তাঁরা দেশী সংবাদপত্র প্রকাশে আদৌ

সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের আশঙ্কা ছিল এইসব কাগজের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে জাগবে রাজনৈতিক চেতনা।

এই চেতনা জাগাবার জন্যই রামমোহন কাগজ বের করলেন।

১৮১৮ সাল থেকে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল ; তখন থেকে কাগজের ওপর সবরকম বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছিল। এই পটভূমিকাতেই রামমোহন বের করলেন 'কৌমুদী' ও 'মীরাৎ'। কৌমুদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু এর পেছনে রামমোহনের সক্রিয় হাত ছিল ; তিনিই ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রথম তিনটি সংখ্যার পরেই ভবানীচরণ কাগজের সংশ্রব ত্যাগ করেন। রামমোহন তখন সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে নেমেছেন ; এই সম্পর্কে তাঁর লেখার সঙ্গে ভবাণীচরণের মতের বিরোধ দেখা দিলো, কারণ তিনি আসলে ছিলেন রক্ষণশীল। তথাপি সেযুগে বাংলা গদ্যলেখকদের মধ্যে ভবাণীচরণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়। ব্যঙ্গরচনায় ইনি খুব দক্ষ ছিলেন।

রামমোহনের সংশ্রব ত্যাগ করতেই ভবাণীচরণকে লুফে নিলেন রাধাকান্ত দেব। তাঁর শক্তিশালী কলমকে রাধাকান্ত কাজে লাগাবার জন্য ভবানীচরণকে ধর্মসভায় সম্পাদক নিযুক্ত করলেন ; আর তাঁকেই সম্পাদক করে বের করলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহনের সংবাদকৌমুদী প্রায় ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের দিকে পুত্র রাধাপ্রসাদ কিছুদিন এর সম্পাদক ছিলেন। সংবাদকৌমুদী ও মীরাৎ-উল্ আখ্‌বার, এই ছুটি কাগজ প্রকাশ করেন রামমোহন একদিকে জনমত, গঠন, অন্যদিকে জনকল্যাণ সাধন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকলেও, রাজনীতির ছিল পত্রিকাছুটির মূল সুর।

এদেশে রাজনীতির জনক রামমোহন।

তাঁর মহিমান্বিত জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই।

নবীন ভারতের এ্যারিস্টটল তিনি।

তিনিই ভারতবর্ষের তখন রাজনৈতিক গুরু।

বিশ্বমৈত্রীর আদর্শও তাঁরই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের কথা পরে বলছি। এখন সাংবাদিক রামমোহনের কথাই বলি। তিনি কাগজ প্রকাশ করেছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে—প্রথম শাসককে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে অবহিত করা; দ্বিতীয়, দেশের লোকের মনেও ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা। তাই সেদিন বাংলায় সংবাদ কৌমুদীর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এদেশে রামমোহনকে জনকল্যাণের পথ প্রদর্শকও বলা চলে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রামমোহন লিখেছিলেন 'সংবাদ কৌমুদীর উদ্দেশ্য জনকল্যাণ···প্রকৃপক্ষে ইহা জনসাধারণের বিষয়ে দেশবাসিগণ তাঁহাদের অভাব অভিযোগ ইংরেজী ভাষায় ছাপাইয়া প্রতিকার না পাইলে, তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে পারিবেন।'

এক কাগজ বের করবার সময় রামমোহন নিজস্ব একটি ছাপাখানা করেন ও কয়েকজন লোককে ছাপাখানার কাজ শিখিয়েছিলেন। সংবাদ কৌমুদী বাংলাভাষায় বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। 'কৌমুদী' সর্বসাধারণের কাগজ, আর 'মীরাৎ' কেবল-মাত্র শিক্ষিতদের জন্য। 'মীরাৎ' ফারসী কথা, এর মানে সমাচার দর্পণ। তখন কলকাতায় ফারসী ভাষায় একটা কাগজও ছিল না, অথচ নাগরিকদের বড় একটা অংশ তখনো পর্যন্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন করত। দেশের চারদিকে, ভারতবর্ষের বাইরে প্রতিদিন কি ঘটেছে, দেশের লোককে তা জানাবার জন্য রামমোহনের ব্যগ্রতার সীমা ছিল না।

'মীরাৎ' বেরুলো ১৮২২ সালে।

কৌমুদী বেরুতো প্রতি মঙ্গলবারে, মীরাৎ প্রতি শুক্রবারে।

বাকিংহাম তাঁর কাগজে রামমোহনের এই প্রচেষ্টাকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন। তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। সেই

সংবাদে রামমোহন বেদনা অনুভব করলেন। মৌখিক বেদনা প্রকাশ তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। মীরাৎ-এর এক সংখ্যায় তিনি আয়র্ল্যাণ্ড-এর পূর্ণ বিবরণ—রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও ভৌগোলিক প্রকাশ করলেন ; সেখানকার দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখালেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত আয়র্ল্যাণ্ড বাসীর সাহায্যের জন্য তিনি কলকাতার সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙালীর কাছে এক আবেদন জানালেন। রামমোহনের এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। এদেশীয় অনেক ইংরেজ ; বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক আয়র্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সংকটত্রাণ বা রিলিফের কাজেরও পথ প্রদর্শক ছিলেন রামমোহন। কিন্তু মীরাৎ কাগজকে শাসকবর্গ খুব সুনজরে দেখতেন না। সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা আমলা-তন্ত্রের পক্ষে সহ্য করা কঠিন ছিল।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন কি করেছিলেন, সেই ইতিহাসটা এখানে বলি। লর্ড হেস্টিংস এর পর ১৮২৩ সালে জন এ্যাডাম এলেন ভারতের অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হয়ে। তাঁর আমলে গোলমাল বাধল সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে। ক্যালকাটা জার্নালের স্বাধীনচেতা সম্পাদক বাকিংহাম সরকারী শাসনকার্যে কিছু মাত্র ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখলেই তার কঠিল সমালোচনা করতেন। এজন্য তাঁকে অনেকবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে সরকারের একটা কাজের বিরুদ্ধে ক্যালকাটা জার্নালে একটা সমালোচনা বেরুল। গভর্নমেণ্ট তখনি ঐ কাগজ বন্ধ করে দেন ও এর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক দুজনকেই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ করেন।

এই ঘটনার পরেই গভর্নর জেনারেল সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করে একটা আদেশ প্রচার করলেন। রামমোহন তার মীরাৎ কাগজে এই আদেশের তীব্র সমালোচনা করলেন। নতুন আদেশে বলা হলো—এখন থেকে কেউ কোন কাগজ বের করতে চাইলে,

প্রধান সচিবের স্বাক্ষরিক সকৌন্সিল গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি নিতে হবে। রামমোহন দেখলেন এই আদেশে সোজাসুজি কাগজের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো। কিন্তু এই নতুন আদেশ সুপ্রীম কোর্ট অনুমোদন না করা পর্যন্ত কার্যকর হতে পারেনা বা আইন বলে গন্য হতে পারে না। রামমোহন এই সুযোগ নিলেন। নতুন আদেশ যাতে আইনে পরিণত হতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি তখনি এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটা আবেদন দাখিল করলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই আবেদনপত্রে সই করেছিলেন ছ'জন বাঙালীসন্তান : রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮২৩ সালের ৩১ মার্চ এটি দাখিল করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট এটা উপেক্ষা করে গভর্নর-জেনারেলের অর্ডিনান্সকে আইনে বিধিবদ্ধ করলেন।

রামমোহন নিরস্ত হলেন না।

তাঁর কামড় ছিল বুলডগের কামড়। বজ্রমুষ্ঠিতে যা ধরতেন তা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা কারো সাধ্যে কুলোত না। তাঁর কণ্ঠে উঠলো প্রতিবাদের হুঙ্কার—আপীল করতে হবে। বিলাতে রাজার কাছে সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হলো ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন চতুর্থ জর্জ। ইংরেজের ন্যায়বিচারে তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। এখান থেকে বিতাড়িত বাকিংহাম সাহেব স্বয়ং সেই আপীল নিয়ে বিলাতে মহাসভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানেও সেটা অগ্রাহ্য হলো।

আবেদন অগ্রাহ্য হলে বটে কিন্তু এর মধ্যে চিরন্তন হয়ে রইল সকল দেশের জন্য একটি মহান সত্য : শোষক ও শাসিত—দুইয়ের মঙ্গলের জন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দরকার। এই সত্যের উদ্গাতা-তাই শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর নমস্য। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহনের এই আবেদন পত্রটির তুলনা নেই।

ভাবে ও ভাষায়, যুক্তি ও তেজস্বিতায় এ এক অতুলনীয় দলিল, এক সময়ে ইংলণ্ডের খবরের কাগজের সামনে এমনি বিপদ দেখা দিয়েছিল। সে দিন সেদেশে খবরের কাগজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কলম ধরেছিলেন মহাকবি মিলটন। আমাদের দেশে রামমোহনকে আমরা সেই ভূমিকায় দেখলাম। ইংলণ্ডের রাজদরবারে আবেদন অগ্রাহ্য হলো। ইংরেজের ন্যায়বিচারে রামমোহনের বিশ্বাস টললো। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। পরাধীন জাতির মনের বেদনা তখন তিনি অন্যভাবে প্রকাশ করলেন। ১৮২৩, ৪ এপ্রিল, মীরাৎ কাগজের একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুলো। তাতে অন্য কিছু ছিলনা—ছিল শুধু একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ফারসীভাষায় মাত্র দুটি লাইনের কবিতা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো।

আব্রু কে বা-সদ যুনই জিগর দস্ত দিহা

বা-উমেদ ই করম্ এ, খাজা, বা দারবান মা ফরোশ।

এর মানে : যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বদলে কিনতে হয়, ওহে মশাই, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের কাছে বিক্রী করো না।

রামমোহন মীরাৎ বন্ধ করে দিলেন।

আত্মসম্মান বিক্রী করলেন না, অনুগ্রহও ভিক্ষা করলেন না।

মীরাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি ১৮২৯ সালের মে মাসে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে আর একখানা ইংরেজী কাগজ বের করেন। তাঁর এই নতুন কাগজের মূলমন্ত্র ছিল ন্যায়ধর্ম অনুমোদিত কাজ করার ক্ষমতার মধ্যেই আছে প্রকৃত স্বাধীনতা। এটি তিনি গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী সিসেরোর লেখা থেকে নিয়েছিলেন। এই পত্রিকার একটি বাংলা সংস্করণও তিনি বের করেছিলেন ; এর নাম দিলেন বঙ্গদূত।'

এইবার রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার কথা।

রামমোহন ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক।

স্বাধীনতার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী ছিলেন তিনি।

এশিয়ার মধ্যে সেদিন তিনিই ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক মানুষ।

সত্য ও ন্যায়—এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মূল ভিত্তি। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন জাতির রাজনৈতিক উদ্যমের মধ্যে যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে শুনতে পেতেন, অমনি তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে উঠত। এর ছুটি ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে। রামমোহন যখন কলকাতায় এসে নানা রকম সংসার কাজে ব্রতী হয়েছেন তখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন দেশের একটা বিরাট উপনিবেশ ছিল। এই উপনিবেশের লোকরা স্পেনের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। ১৮২১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপানিবেশগুলি স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হলো। এই সংবাদ যখন ভারতবর্ষে এলো তখন রামমোহনই সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি টাউন হলে নিজের খরচে একটা বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন।

ঐ একই বছরে যখন অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল নেপলস-এর স্বাধীনতা-সংগ্রামের গলা টিপে ধরলো, তখন দুঃখে, ক্ষোভে রামমোহন ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক ও তাঁর বন্ধু বাকিংহামকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 'নেপলসবাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী বলে মনে করি ; তাদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলে গণ্য করি। স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোন দিন জয়ী হয়নি। এবং শেষ পর্যন্ত কোন দিন জয়ী হবেও না।'

এর থেকে বুঝতে পারো রামমোহনের বিশ্বমানবতা বোধ কত প্রবল ছিল, রাজনৈতিক অধিকার চেতনা কত প্রখর ছিল। নইলে কোথায় নেপলস আর কোথায় কলকাতা—কেমন করে তাঁর সমস্ত হৃদয় নেপলসবাসীদের বেদনায় ব্যাথিত হয়ে উঠেছিল। তিনি যত বড় ধর্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারক ছিলেন তার চেয়েও স্বাধীনতার

পূজারী হিসাবে তিনি আরো বড়ো ছিলেন। এর আর এক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

১৮৩০ সাল। য়ুরোপে তখন ফরাসী বিপ্লব সফল হয়েছে। রামমোহন তখন সমুদ্র পথে য়ুরোপ চলেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই সেদিন ফরাসী বিপ্লবকে সকলের আগে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। ফরাসী দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে ইংলণ্ড যাবার সময় নেটাল বন্দরে তিনি একখানা ফরাসী জাহাজ দেখতে পেলেন। সেই জাহাজে একটিবার যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। তাঁকে সেই ফরাসী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। ফরাসীরা স্বাধীনতার সেই পূজারীকে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্বর্ধনা জানালো। রামমোহন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করলেন। এদৃশ্য কল্পনা করলেও আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

কর্মজীবনে রামমোহনের একমুহূর্তেরও অবসর ছিল না।

দেশের হয়ে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের জন্য তিনি আর একটা পদক্ষেপ করলেন।

১৮২৬ সাল। এই বছরের গোড়ার দিকে জুরি আইন পাশ হলো। রামমোহন দেখলেন, এই আইনের ফলে বিচার ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে আর সমাজজীবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আইনে বলা হলো, কোন হিন্দু কি মুসলমান 'জুরার' দেশীয় কি বিদেশীয় কোন খৃষ্টানের বিচার করতে পারবে না; কিন্তু খ্রীষ্টান জুরারের পক্ষে ঐ রকম কোন বিধি নিষেধ থাকবে না। এমন কি, দেশীয়দের বিচারের সময়ও কোন হিন্দু কি মুসলমান গ্র্যাণ্ড জুরিতে বসবার অধিকার পাবে না।

রামমোহন খুব মন দিয়ে আইনটা পড়লেন।

আইন শাস্ত্রেও তাঁর যে প্রতিভা ছিল তা এবার জানা গেল।

আইনের প্রত্যেকটি ধারা ও সমাজজীবনে এর কি ফল হতে পারে

তা তিনি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এই আইন দেশের বা সমাজের কিছুমাত্র কল্যাণ করবে না। শাসকের আইন তৈরী করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই আইন শাসিতের পক্ষে ভাল হবে কি মন্দ হবে তা বিচার করে দেখতে হবে।

রামমোহনের কলমে তৈরী হলো প্রতিবাদের অস্ত্র।

তিনি এই অন্যায় বিধানের প্রতিবাদ করলেন।

রামমোহনের সমস্ত জীবনটাই ছিল প্রতিবাদের জীবন—ঘরে ও বাইরে।

অবশ্য সমস্ত প্রতিবাদই তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথে করতেন। সেইজন্যই তো তাঁকে বলা হয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক। আবেদন লিপি তৈরী হলো। তাতে সই দিলেন অনেক হিন্দু ও মুসলমান। ইংলণ্ডের মহাসভায় সেটি পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। এখান থেকে রামমোহন সেটি মিস্টার ক্রফোর্ড নামে একজন প্রভাবশালী ইংরেজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিই সেটি মহাসভায় উপস্থাপিত করেছিলেন। এটি তাঁর নিজেরই রচনা ছিল। ইংলণ্ডের অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি এই আবেদন পত্রের যুক্তি প্রণালী দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সংবাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যায় রামমোহন ইংরেজ সরকারের যে দুটি কল্যাণকর কাজের প্রশংসা করেছিলেন তার একটা হলো খবরের কাগজের স্বাধীনতা, অপরটি জুরি প্রথা প্রবর্তন। তিনি নিজেই দেখেছিলেন কেমন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। এই জুরিপ্রথা তখন শুধু সুপ্রীম কোর্টের ছিল আর একমাত্র বৃটিশ প্রজারই ছিল জুরি হওয়ার অধিকারী। রামমোহন চেয়েছিলেন জুরিপ্রথা যেন মফঃস্বলের অন্যান্য আদালতেও চালু করা হয় এবং এদেশীয় লোকদেরও যেন জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮২৬, ৫ মে বিলাতের পার্লামেন্টে 'ইণ্ডিয়ান জুরি বিল' পাশ হলো। রামমোহন

দেখলেন যে, এই আইনে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে অখৃস্টানদের অধিকার খর্ব করা হলো। এই নতুন আইনে দেশের স্বার্থ কতখানি আহত হয়েছে, সংবাদ কৌমুদীতে তার একটা আলোচনা প্রকাশিত হলো। তাতে রামমোহন সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখালেন, জুরি আইন যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থা ও মর্যাদা খ্রীস্টানদের পায়ের তলায় লুটিয়ে গেল।

রামমোহন এই জুরি আইনের প্রতিবাদে মহাসভায় যে আবেদন করেন তাতে সই দিয়েছিলেন ১১৬ জন মুসলমান ও ১২৮ জন হিন্দু। জুরিটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘ আবেদনপত্রে রামমোহন নতুন জুরি মিলে হিন্দু ও মুসলমানদের যে অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং খৃষ্টানদের কাছে তাদের যে কতখানি হেয় করা হয়েছে সে সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ রেখেছেন। এই সময়ে তিনি এক চিঠিতে তাঁর বিলাতের এক ইংরেজ বন্ধুকে লিখেছিলেন। এদেশীয় জনগণের কথা বিবেচনা না করে এবং সে বিষয়ে কোন পরামর্শ না করে গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই যে সব আইন পাশ করেছেন তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত ও ব্যাথিত।'

এই দুঃখ বেদনার হলাহল কণ্ঠে ধারণ করেই তো একা রামমোহন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর স্বজাতির হয়ে সবরকম অধিকার দাবী করেছিলেন। তাঁর এই আবেদনপত্র মহাসভায় আলোচিত হয়েছিল কিন্তু গ্রাহ্য হয়নি। এই জুরি বিলের যিনি প্রবর্তক সেই মিষ্টার ওয়েন মহাসভায় দাঁড়িয়ে শুধু এইটুকু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, খুব শীঘ্র কোম্পানীর সনদ নতুন করে দেওয়া হবে, তখন ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করে তার উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। ভারতবাসী দেশের শাসন ব্যবস্থায় যাতে আরো অধিকার পায় রামমোহনের সর্বদা সেই চিন্তা ছিল। এই অধিকার আদায় করার জন্যই তো তিনি সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেমের তুলনা হয় না।

নয়

নানা রকম সংস্কার কাজের ভেতর দিয়ে পনর বছর কেটে গেল।

এই সময়ে সমাজ কল্যাণমূলক যেসব কাজে রামমোহন লিপ্ত ছিলেন যে জন্য গোঁড়া হিন্দুদের তাঁর ওপর রাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ তাঁর ওপর সমানভাবে বর্ষিত হয়েছিল। এমন কি, কতবার তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টাও হয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য রামমোহন মিঃ মার্টিন নামে এক জন ইংরেজ দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন। রামমোহন যখনি বাড়ির বাইরে কোথাও যেতেন মার্টিন সাহেব তাঁর মনিবের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। এইভাবে মৃত্যু ও বিপদকে ডাইনে ও বামে রেখে এই যুগপুরুষ একের পর এক কাজ করেছেন। তাঁর সকল চিন্তা ও কাজের মধ্যে শুধু তাঁর স্বজাতির উন্নতির চিন্তাই স্থান পেয়েছিল। বীর যোদ্ধার মতোই জীবনের রাজপথে তিনি চলতেন সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে। তাঁর বলিষ্ঠ কাঁধে থাকত সত্য ও ন্যায়ের পতাকা।

পনর বছর পরে রামমোহন ইংলেণ্ড যাত্রা করেন।

আধুনিক কালে তিনি প্রথম ভারতবাসী যিনি সমুদ্রযাত্রা

করেছিলেন। এই কাজটা তখন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বিলাত গিয়েছিলেন কেন ? প্রথম, তিনি সেই দেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন , দ্বিতীয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন করে সনদ দেওয়ার সময় ইংলণ্ডে উপস্থিত থেকে ভারতবাসীর হয়ে কিছু স্থবিধা আদায় করার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন ; তৃতীয়, সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আপীল যাতে না গৃহীত হয় সেজন্য চেষ্টা করা, আর মহা-সভায় দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আবেদন তদারক করা।

কোম্পানীর সরকার থেকে মুঘল সম্রাটকে তখন মাসে মাসে যে টাকা দেওয়া হতো তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য, প্রয়োজনের তুলনায় সেটা খুবই কম ছিল। সম্রাট তাই বিলাতে এজন্য আবেদন করবেন ঠিক করেছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাচ্ছেন তখন তিনি দিল্লি থেকে তাঁর এক প্রতিনিধিকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিনিধিটি এসে রামমোহনকে সম্রাটের অনুরোধের কথা জানাতেই তিনি রাজী হলেন। বাদশা তাকে তখন 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁরই দূত হয়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি রাজা রামমোহন রায় নামে পরিচিত হন।

বিলাত যাবার আগে তিনি আর একটি বড় কাজ করলেন।

স্থাপন করলেন কলকাতা শহরের বুকে সর্বজনীন একটা উপাসনা মন্দির। তার নাম দিলেন 'ব্রহ্ম সভা,। ১৮২৮ সালের অগস্ট মাসে জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের ওপর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীতে সকল ধর্মের লোকের উপাসনার জন্য এটি স্থাপিত হয়। বছরখানেক বাদে কাছেই একটা আলাদা জমির ওপর ব্রহ্মসভার নতুন বাড়ি তৈরী হয়। এই উপাসনা মন্দিরই পরে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য আর নির্জন পাহাড়ে বা বনে যাবার

দরকার নেই, শহরের মানুষের মধ্যেই একাজ করা যেতে পারে। এই নতুন উপাসনা গৃহটি রামমোহন একটি দলিল করে সর্বসাধারণকে দান করে যান। পৃথিবীর সকল জাতির ও সকল ধর্মের মানুষের জন্য উপাসনা গৃহ সেই প্রথম তৈরী হয়। সেই দলিলে রামমোহন লিখলেন, 'যে কোন লোক ভদ্রভাবে, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে আসবেন। এই উপাসনা গৃহের দরজা তাঁরই জন্য খোলা থাকবে। তিনি যে দেশের যে জাতির বা ধর্মের লোকই হোন না কেন।' এই দলিলে কোন শাস্ত্রের উল্লেখ নেই, কারণ এই উপাসনা-গৃহটি রামমোহন শাস্ত্র নয়, জ্ঞান ও যুক্তির ওপরই স্থাপন করে ছিলেন। এইভাবেই সেদিন তিনি পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে গিয়েছিলেন এক উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব যা এর আগে আর কেউ পারে নি।

১৮৩০ সাল, ১৫ই নভেম্বর।

'আলবিয়ন' জাহাজে চড়ে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

সঙ্গে চললো দুজন চাকর রামহরি দাস ও সেখ বকসু, পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায় আর বারো বছরের বালক রাজারাম। রাজারাম তাঁর পুত্র। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাদারল্যাণ্ড রামমোহনের সহযাত্রী ছিলেন। পাশপোর্টে লেখা ছিল রাজা রামমোহন রায়। যাবার আগে তিনি একদিন জোড়াসাঁকোয় এসে তাঁর বন্ধু ও অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আরো অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সাগরে পাড়ি দিলেন। তিনি যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁর এক পত্নি, দুই পুত্র ও দুই পৌত্রী তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ তাঁর দুই পুত্র; বড় ছেলের দুই মেয়ে—চন্দ্রজ্যোতি ও মৈত্রেয়ী। নাতনীদের নাম তিনিই রেখেছিলেন। বড় নাতনীর বিয়ের পরেই তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পথ শুধু একটি বিষয়

রামমোহনের সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। রিফর্ম বিল বা শাসন সংস্কার। রামমোহন যে বছর সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এলেন তার ঠিক দুবছর আগে এক সনদ আইনের বলে বিলাতের রাজা ভারতের কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই মেয়াদ ১৮৩৩ সালে শেষ হবার কথা ও তখন আবার চতুর্থ বারের জন্য কোম্পানীর বিশ বছরের নতুন সনদ পাওয়ার কথা। রামমোহন এটা জানতেন। তিনি বিলাত যাওয়ার কিছু আগে থেকেই শাসন-সংস্কার নিয়ে বিলাতের মহাসভার এক কমিটিতে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঐ কমিটিতে সাক্ষী দেবার জন্য ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে রামমোহনকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি দেখলেন দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকার ও সুবিধা আদায় করে নেবার এই সুযোগ। এই জন্যেই তো তিনি বিলাত যাওয়ার জন্য অমন ব্যগ্র হয়েছিলেন।

পথিমধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

জাহাজ এলো উত্তমাশা অন্তরীপে। তখন এই পথ দিয়েই য়ুরোপের জাহাজ যেত। কিছুক্ষণের জন্য রামমোহন তীরে নামলেন। ঘণ্টা দুই পরে যখন তিনি জাহাজে ফিরে আসেন তখন ঘটলো একটা দুর্ঘটনা। যে সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে ওঠানামা করতে হয় সেটা। ঠিকভাবে লাগানো ছিল না বলে তিনি পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আঘাত পান। এই আঘাতে তাঁর একটা পা জখম হয়ে যায়। আঠার মাস খুব কষ্ট ভোগ করেন। পরে সুস্থ হলেও তিনি এ জীবনে পায়ের ব্যথা থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি।

উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে জাহাজ চললো। সমুদ্রের মাঝখানে একদিন রামমোহনের চোখে পড়ল স্বাধীন পতাকাশোভিত দুটি ফরাসী জাহাজ। তাই দেখে তিনি বুঝলেন ফরাসী বিপ্লব তাহলে সার্থক হয়েছে। এই বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সফল হলো মানুষের মুক্তি স্বপ্ন। এই মুক্তিস্বপ্নই তো আচ্ছন্ন করেছিল রাজার সমস্ত অন্তর।

ফরাসী জাহাজ দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। কোথায় গেল তাঁর পায়ের ব্যাথা। ভাঙা পায়েই তিনি ঐ জাহাজে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হলেন। তাঁকে ফরাসী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। ফরাসীরা রামমোহনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ফ্রান্সের স্বাধীন-পতাকা অভিবাদন করলেন তিনি। এক সুগভীর আনন্দে ভরে উঠল তাঁর অন্তর। জাহাজ থেকে চলে আসবার সময় তাঁর পুলকিত অন্তর বার বার উচ্চারণ করতে লাগল : জয়, জয়, ফ্রান্সের জয়। তাঁর স্বদেশেরও মুক্তি চাই। বিষুবরেখার কাছাকাছি আসতেই ইংলণ্ড থেকে আসা একটি জাহাজের দেখা পাওয়া গেল। সেই জাহাজের আরোহীদের কাছ থেকে কিছু খবরের কাগজ সংগ্রহ করা হলো। খবরের কাগজ থেকে জানা গেল ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভার অদল-বদল হয়েছে। রামমোহন আনন্দিত হলেন। তাঁর আশা হলো, এর ফলে তাঁর দেশের শুভ হবে।

'আলবিয়ন' পালের জাহাজ, তার গতি মন্থর।

প্রায় পাঁচমাস পরে রামমোহন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলেন।

সাদারল্যাণ্ড সাহেব লিখেছেন : যে পাঁচমাস তিনি সমুদ্রে ছিলেন তখন জাহাজে তাঁর নিজের ঘরেই আহার করতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করতেন। দুপুরের আগে ও সন্ধ্যাবেলায় ডেকের ওপর বেড়াবার সময় তিনি অনেকের সঙ্গে উৎসাহভরে আলাপ আলোচনা করতেন। রাতে খাওয়ার পরেও তিনি সকলের সঙ্গে বসে নানা ধরনের আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। জাহাজের সকল যাত্রীই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন ; প্রত্যেকেই তাঁকে যত্ন করার জন্য ব্যস্ত হতেন। এমন কি জাহাজের খালাসীরাও তাঁর সেবা করার জন্য তৎপর থাকত। তিনি সব সময়ই শান্ত ও প্রফুল্ল থাকতেন। কোন কারণে জাহাজের গতি যখনি কমে যেত, তখনি তিনি

চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তাঁর আশংকা ছিল বুঝি তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছবার আগেই কোম্পানীর নতুন সনদ সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়ে যাবে।

১৮৩১ সাল, ৮ই এপ্রিল।

লিভারপুল বন্দরে জাহাজ পৌঁছল।

রামমোহন বন্দরে নামলেন। তাঁর আগে তাঁর নাম, তাঁর খ্যাতি এদেশে পৌঁছেছিল। উইলিয়ম র‍্যাথবোন রামমোহনকে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়িতে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা উঠলেন একটা হোটেলে। এখানে অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রামমোহন এসেছেন শুনে অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বিশিষ্ট লোকজন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাঁর কাছে আসতেন। রামমোহনও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বাইরে যেতেন। তাঁর সারাদিনের সমস্ত সময় এইভাবেই কেটে যেত। একদিন তিনি একেশ্বরবাদী একটি গীর্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দিলেন। উপাসনার শেষে উপাসকগণ রামমোহনকে কাছ থেকে দেখার জন্য তাঁর চারপাশে ভিড় করতে লাগলেন। এ দৃশ্য আজ কল্পনা করতেও আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

এইখানে তিনি পরিচিত হলেন উইলিয়ম রস্কোর সঙ্গে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। এঁর বয়স তখন আটাত্তর বছর। রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের নীতি ও খ্রীষ্টের উপদেশ সম্পর্কে একখানি বই লিখেছিলেন। পরে রামমোহন খ্রীষ্ট উপদেশ প্রকাশিত হলে রস্কো বই দুটির মধ্যে সাদৃশ্য দেখে খুশি হন। তখন থেকেই বহুদূরের সেই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের কর্মপ্রয়াস তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে ও তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। রস্কোর নিমন্ত্রণে রামমোহন তাঁর বাড়িতেও একদিন গিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

এপ্রিলের শেষাশেষি রামমোহন লিভারপুল থেকে লণ্ডন যাত্রা করলেন। পথে ম্যাঞ্চেস্টার নগরের কলকারখনা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষ, নারী ও বালক শ্রমজীবিরা সবাই কাজ ফেলে দলে দলে তাঁকে দেখতে এসেছিল। তাদের কাছে তিনি ভারতীয় রাজা বলে সমাদৃত হয়েছিলেন। অনেকে তাদের কয়লা মাখানো হাতেই তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে ব্যগ্র হোলো। মেয়েরা জানালো তাঁকে শ্রদ্ধা। আজ, এতকাল বাদেও আমরা যখন এই দৃশ্যটি কল্পনা করি তখন কি আমাদের হৃদয় গর্বে ও আনন্দে ভরে ওঠে না?

সন্ধ্যার কিছু পরে রামমোহন লণ্ডনে উপস্থিত হলেন। উঠলেন একটা হোটেলে। রামমোহন এসেছেন শুনে প্রথম যিনি তাঁর সঙ্গে সেই রাত্রেই সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তিনি প্রখ্যাত মনীষী জেরিমি বেনাম। রাজা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বেন্থামের সাক্ষাৎ হয়নি; তিনি একটি কার্ডে নিজের পরিচয় লিখে রেখে আসেন, পরে বেন্থামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। লণ্ডনে প্রতিদিন অনেক সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ লোক রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। প্রতিদিন তাঁর ১২৫নং রিজেন্ট ষ্ট্রীটের বাড়ির সামনে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত।

লণ্ডনের একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানরা প্রকাশ্যে রামমোহনকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই সভায় তিনি যেরকম সম্মান লাভ করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম লোকের ভাগ্যে সেরকম ঘটেছে। পরাধীন ভারতের একটি মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনের এক প্রকাশ্য সভায় শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছেন—এ দৃশ্য কল্পনার অতীত! শুধু খ্রীষ্টান যাজকদের কাছে নয়, লণ্ডনে তিনি সব জায়গাতেই অভিনন্দিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকরা তাঁকে এক প্রকাশ্য ভোজসভায় সম্মান দেখালেন। এমন কি ইংলণ্ডের রাজা

তাঁর বাকিংহাম প্রাসাদে সমাদরের সঙ্গে রামমোহনকে গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডনের জ্ঞানী-গুনীজনদের সভা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁদের বাৎসরিক সভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বেডফোর্ড স্কোয়ার, লণ্ডন। এইখানে একটা বাড়িতে থাকতেন ডেভিড হেয়ারের ভাইরা। রামমোহন ইংলণ্ডে যাচ্ছেন, এই খবর হেয়ার সাহেব তাঁর ভাইদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর দেখাশুনা করবার জন্য তাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন। তাই রামমোহন তাঁর রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে হেয়ার সাহেবের ভাইদের কাছে উঠে এলেন। এইভাবে অল্পদিনেই রামমোহন ইংলণ্ডের সুধীসমাজে, সেখানকার অভিজাত সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। সকলের মুখে তাঁর কথা, তাঁর প্রশংসা।

একজন অসাধারণ চরিত্রের মানুষ !

একজন সত্যকার মানবহিতৈষী।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন নির্ভীক আপোষহীন যোদ্ধা। এই-ভাবে তিনি ইংলণ্ডের সমাজের সকল স্তরে বিপুল সমাদরের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। লণ্ডনে থাকবার সময়ে একদিকে রামমোহনকে যেমন নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সেই সঙ্গে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ও কল্যাণের চেষ্টায় তাঁকে লেখনিও চালনা করতে হতো। অন্যান্য কাজেও অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। একা রামমোহন যেন সেদিন একশো রামমোহন হয়ে কাজ করতেন। এসবই তিনি করতেন শুধু তাঁর স্বদেশবাসীর সকল রকম ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য। কতদিকে যে তাঁকে মাথা চালাতে হতো তা আমরা ধারণাই করতে পারব না। ভারতে কোম্পানী শাসনের কোথায় গলদ তার যে ছবি তিনি ওদেশের মহাসভার সভ্যদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা অনেকের মনে দাগ কেটেছিল। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি ইংলণ্ডের

মহা সভায় ভারতের দাবী যাতে গ্রাহ্য হয় সেজন্য রামমোহনের চিন্তা চেষ্টার বিরাম ছিল না।

ইংলণ্ডে থাকবার সময়ে তিনি যে তিনখানি বই লিখেছিলেন তার একটিতে রামমোহন ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে ইচ্ছুক য়ুরোপীয়দের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এটি ১৮৩২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসাবে এটাই ছিল তাঁর শেষ রচনা। তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির মধ্যে কি বিরাট আকাঙ্খা ছিল তা এই বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে এটাকে রাজা রামমোহনের শেষ 'উইল' বা চরমপত্র বলা যেতে পারে। এই বইটিতে রাজা তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে এই পাঁচটি মূল্যবান কথা বলে গিয়েছেন :

১। ভারত—যেখানে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হবে।

২। ভারত—যেখানে এক উদার ও সর্বজনীন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করবে।

৩। ভারত—যার সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্য ধরনের হবে।

৪। ভারত—যা একদিন সম্ভবত স্বাধীনতা লাভ করবে।

৫। ভারত—যা সমস্ত এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে।

এমন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রামমোহনই করতে পারতেন।

আমাদের স্বাধীনতালাভের একশো পনের বছর আগে শাসক-জাতির রাজধানীতে বসে রামমোহন লিখেছেন : ভারত স্বাধীন হবে।

একথা ভাবতেও আমাদের মনে রোমাঞ্চ জাগে।

রাজা রামমোহনকে তাই যুগসারথি বলতে আমাদের বাধে না।

এই দূরদৃষ্টি, এই সাহস একমাত্র তাঁর মতো যুগসারথির পক্ষেই সম্ভব।

আগেই বলা হয়েছে, প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিলাত যাওয়ার। এক—দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য ; দুই—সতীদাহ

নিবারণ আইনের প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন ; তিন—কোম্পানীকে নতুন করে সনদ দেওয়া ; শেষের উদ্দেশ্যটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো। এই তিনটি উদ্দেশ্যই তাঁর সফল হয়েছিল। মহাসভায় কোম্পানীকে যখন নতুন করে সনদ দেওয়ার বিলটি আলোচনা হয় তখন দিনের পর দিন রামমোহন সেখানে উপস্থিত থাকতেন। সিলেক্ট কমিটিতে তিনি লিখিতভাবে যেসব মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন সেগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় তাঁর চিন্তা কতদূর পরিষ্কার ছিল। একটা উদাহরণ দিই।

বিলাত থেকে যেসব কম বয়সের সিভিলিয়ান এদেশে চাকরি নিয়ে আসতেন তাদের শিক্ষাদীক্ষা, কর্তব্যবোধ ও চরিত্র উন্নত ধরনের হওয়া দরকার—একথা রামমোহন বলেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, চব্বিশ বছর বয়সের কম কোন ইংরেজকে সিভিলিয়ানরূপে ভারতে পাঠানো উচিত নয়। আরো বলেছিলেন ঃ অযোগ্য লোকের ওপর যেন বিচারকার্যের ভার দেওয়া না হয়। এছাড়া, দেশীয় লোককে বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে বিচার বিভাগে নিযুক্ত করার আবশ্যকতার ওপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন। এর ফলে শাসক ও শাসিত দুজনেরই উপকার হবে।

য়ুরোপের লোকেদের ভারতবর্ষে বসবাসের ফলে কি সুবিধা কি অসুবিধা হতে পারে রামমোহন এই বিষয়টিরও বিশদ আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মত ছিল ঃ ওদেশের লোকেরা এদেশে এসে যদি চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করে তাহালে কৃষি ও বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতি ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির দ্বারা এদেশের জনসাধারণ উপকৃত হবে। তাদের সংস্পর্শে এসে এদেশের অধিবাসীদের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূর হবে। য়ুরোপীয়দের সাহায্যে এদেশে সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং দেশময় ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রসার ঘটবে। 'ইংলণ্ড ও ভারত এক যোগসূত্রে যদি বাঁধা পড়ে তাহলে দুই দেশেরই কল্যাণ,—এই কথার মধ্যে নিশ্চয়ই রামমোহনের দূরদৃষ্টি

ছিল? তবে তিনি এই কথাও বলেছিলেন যে, কেবল মাত্র শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র ও মূলধনের অধিকারী য়ুরোপীয়দেরই ভারতবর্ষে বসবাস করার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে অর্থ নৈতিক উন্নতির বিষয়টা রামমোহনের চিন্তার পরিধির বাইরে ছিল না এই সম্পর্কে তাঁর একটা প্রয়াসের কথা উল্লেখ করছি। এদেশে নুনের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ছিল কোম্পানীর হাতে। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময় কোম্পানীর কর্মচারীরা নুনের ব্যবসায় লিপ্ত থাকত। আর তাদের খুশি মত দাম ঠিক করে প্রচুর লাভ করত। এর ফলে এদেশের অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। বাংলার অনেক লোক এই নুন তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কোম্পানীর অত্যাচারের ফলে তাদের কষ্টের শেষ ছিল না। অথচ এই কাজ ছাড়বার উপায়ও ছিল না। কোম্পানী নুন তৈরি করার জন্য এদেশীয় এজেন্ট নিযুক্ত করত। তারাও নুন গুদাম জাত করে রেখে দেশে কৃত্রিম নুনের অভাব সৃষ্টি করত, আর বেশি চড়া দরে তা বিক্রী করত। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এত বেশি পরিমাণে ভেজাল দিত যে নুন হয়ে উঠত একেবারে অখাদ্য। সেই অখাদ্য নুন খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বিদেশ থেকে যে নুন আমদানি করা হতো তার ওপর কোম্পানী এত বেশী শুল্ক ধার্য করেছিল যে তা সাধারণ লোকের পক্ষে কেনা দুঃসাধ্য ছিল।

সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে রামমোহনকে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠানো হয়েছিল। রামমোহন সেইসব প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত বিষয়টি নিপুণভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বলবার কথা ছিল : নুন খুব দরকারী জিনিস—আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ইহা অপরিহার্য। কিন্তু বেশি দামের জন্য তা একটু কেনাও গরীব লোকের পক্ষে দারুণ কষ্টকর। এর ফলে ভাতের সঙ্গে তরকারীর ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তাদের আর থাকে না; শুধুমাত্র নুন দিয়েই ভাত

খেতে হয়। অথচ নুনের দাম ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক কম ও তা অনেক ভাল। ঐ নুন যদি এদেশে আমদানি করা হয় তাহলে মাটি মেশানো অখাদ্য নুন চড়া দামে কেনার দুর্গতি থেকে এদেশের লোকেরা পরিত্রাণ পাবে।

ভাবতে পারো, কিরকম সহানুভূতি ভরা হৃদয় থাকলে একজন মানুষ তাঁর দেশের জনসাধারণ সম্পর্কে এ রকম চিন্তা করতে পারেন ?

সতী-আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেছিলেন। ওদেশের লোকেদের সহানুভূতির জন্য রামমোহন সতী-আইন সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি মন্তব্য ছেপে প্রচার করলেন। শাস্ত্র থেকে প্রমাণ তুলে তিনি প্রমাণ করলেন, এই নৃশংস প্রথাটির পেছনে শাস্ত্রের কোন সমর্থন নেই। এছাড়া, তিনি অনেকের নাম উল্লেখ করে দেখালেন যে, আদালতের বিচারকদের, সরকারী অফিসারদের ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের সমর্থন ও সুপারিশের পর গভর্ণর জেনারেল ঐ আইনটা পাশ করেছেন। ১৮৩২ সালের জুলাই মাসে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের শুনানী শুরু হলো। রামমোহন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপীল বাতিল হয়ে গেল। এই খবর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের দরদী মানুষ আনন্দিত হলো। এতদিনে হিন্দুসমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথার শেষ হলো। বাদশার দৌত্য কার্যও সফল হয়েছিল। তাঁরই চেষ্টায় বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি পায়। রামমোহনের এই সফলতাও ভারতবর্ষে আলোড়ন জাগিয়েছিল।

এইভাবেই সেদিন রামমোহনের বিলাত যাওয়া সফল হয়েছিল। তাঁর সেই সফলতা ভারতের ললাটে এঁকে দিয়েছিল গৌরবের টিপ।

দশ

১৮৩২ সাল। শরৎকাল।

রামমোহন লণ্ডন থেকে প্যারিস যাত্রা করলেন।

সঙ্গে চললেন ডেভিড হেয়ারের এক ভাই। ফরাসী দেশেও তখন তাঁর খ্যাতি আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের পীঠস্থান এই দেশ দেখবার জন্য রামমোহনের মনে এমন আগ্রহ জন্মেছিল যে, লণ্ডনে থাকবার সময়েই তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। সেই সময়ে কোন বিদেশীর পক্ষে বিনা ছাড়পত্রে ফরাসী দেশে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। ছাড়পত্র! স্বাধীন দেশে তিনি যাবেন, তার জন্য আবার পাশপোর্টের দরকার! রামমোহনের মন এই নিয়ম মানতে চাইল না। তিনি তখন লণ্ডন থেকে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখলেন, সেই চিঠির তারিখ ছিল ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১।

চিঠির গোড়ায় এই কথাগুলো ছিল: 'শুধু ধর্ম নয়, নিরপেক্ষ সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার। জাতিগুলি তারই আলাদা আলাদা

শাখা। সকল দেশের শিক্ষিত লোকই ইচ্ছা করেন তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগের ফলেই তো সমস্ত বিশ্বমানবের মিলন ও প্রীতির পথ প্রশস্ত হয়। সেই পথে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মিলনের সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার—কত কাল আগে রামমোহনের চিন্তায় এই সত্য ধরা পড়েছিল, সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এমন প্রতিভা, এমন দূরদৃষ্টি বিরল। দেশ জাতি নির্বিশেষে মানুষের ঐক্যের বাণী সেদিনকার পৃথিবীতে একমাত্র রামমোহনের কণ্ঠেই ঝংকৃত হয়েছিল। রামমোহনের এই চিঠির মধ্যেই কি আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) বা জাতিসংঘের পূর্বাভাষ দেখতে পাই না? তাঁর চিঠি ব্যর্থ হয়নি। তিনি বিনা পাশপোর্টেই ফ্রান্সে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন।

রামমোহন প্যারিসে এলেন।

এই ভারতীয়ের চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে, সকলের ওপর তাঁর সেই রাজোচিত, উন্নতশীর্ষ, বলিষ্ঠ আকৃতি দেখে ফ্রান্সের রাজনীতিজ্ঞ ও পাণ্ডতগণ যারপর নাই বিস্মিত হলেন। ইংলণ্ডের মতো এখানেও তিনি খুব সমাদর পান। ফ্রান্সের বিদ্বান লোকদের একটা সমিতি ছিল; তার নাম 'সোমিয়েত আসিয়াতিক। এই সমিতি আগে থেকেই রামমোহনকে তাদের সভ্য মনোনীত করেছিলেন। সম্রাট ফিলিপ সসম্মানে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন; এমন কি কয়েকবার তাঁকে রাজকীয় ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করে একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আহার করলেন। এক হোটেলে বিখ্যাত কবি স্যার টমাস মূর একদিন তাঁকে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করলেন। কয়েক মাস পরে ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে রামমোহন লণ্ডনে ফিরলেন।

লণ্ডনের নারীসমাজও রামমোহনকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিনয় প্রত্যেককে মুগ্ধ করত। তাঁর কথাবার্তা ছিল যেমন বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি হৃদয়গ্রাহী

তাঁর মিষ্ট মধুর ব্যবহারে, বিশেষত স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ফলে তিনি ইংলণ্ডের নারীসমাজের চিত্ত জয় করেছিলেন। মিস মেরী কার্পেন্টার নামে এক বিদুষী মহিলা রামমোহনের লণ্ডন-জীবন নিয়ে একখানি সুন্দর বই লিখেছিলেন। এই বইতে তিনি রাজার বিদ্যা-বুদ্ধি, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিনয় ও সরলতা এবং দেশের জন্য তাঁর নানারকম কর্মপ্রচেষ্টার খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর সুন্দর স্বভাব ও ভদ্রব্যবহারে লণ্ডনের অভিজাত সমাজের মেয়েরা পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন।

লণ্ডনে ফিরে তিনি আবার তাঁর কাজে লেগে গেলেন।

ভারতে শাসন সংস্কার বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যেসব পরামর্শ দিয়েছিলেন তা খুব মূল্যবান ছিল। তাঁর প্রস্তাবের বেশির ভাগ মহাসভায় গৃহীত না হলেও রামমোহন যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়া যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্যারিস থেকে ফিরে রামমোহন যে কয়দিন লণ্ডনে ছিলেন তখন বেশির ভাগ সময় তিনি মহাসভা ভবনে অতিবাহিত করতেন। 'রিফর্ম বিল' বা শাসন সংস্কার সংক্রান্ত বিলটির আলোচনার সময় তাঁকে নিয়মিত ভাবে এখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। ১৮৩৩ সালের আগস্ট মাসে ঐ বিল পাশ হয়ে গেল। এখন থেকে কোম্পানী বাণিজ্য অপেক্ষা ভারত শাসনের দিকেই বেশি করে মন দিলেন।

রামমোহনের লণ্ডন প্রবাস শেষ হলো।

সব কাজ শেষ করে তিনি এলেন ব্রিস্টলে।

সঙ্গে এলেন তাঁর সঙ্গীরা ও হেয়ার সাহেবের বোন। অনেকদিন থেকেই তিনি ব্রিস্টলে যাবার জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। পালিতপুত্র রাজারাম আগে থেকেই এখানে ছিল। ইংলণ্ডে পৌঁছেই তার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য রামমোহন তাঁকে ব্রিস্টলে একটি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। লণ্ডনের কোলাহল ও

কর্মব্যস্ততার চেয়ে ব্রিস্টল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নির্জন। ইংলণ্ডে এসে অবধি কী পরিশ্রমই না তাঁকে করতে হয়েছে। দেশের ও দশের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম তিনি সমানে করে এসেছেন আঠার বছর ধরে —সেই যেদিন তিনি রংপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশ্রাম কাকে বলে তা তিনি জানেননি। ব্রিস্টলের শান্ত পরিবেশ তাই তাঁর কর্মক্লান্ত দেহ ও মনকে তৃপ্তি দিল।

১৮৩৩ সাল। সেপ্টেম্বরের প্রথমেই রামমোহন ব্রিস্টল এসে পৌঁছলেন। বিশিষ্ট ধর্ম-যাজক ডাক্তার কার্পেন্টার ছিলেন রামমোহনের একজন অনুরাগী বন্ধু। তিনি আগে থেকে এখানে একটি সুন্দর বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। স্টেপলটন গ্রোভ দেখতে ঠিক একটি মনোরম কুঞ্জের মতোই ছিল। এটি ছিল কুমারী ক্যাসেলের বাড়ি। তারই অতিথি হয়ে রামমোহন এখানে এলেন। পরিচর্যার ভার ছিল কুমারী হেয়ারের ওপর। পরম আত্মীয়ের মত ইনি প্রবাসে রাজার সেবা করেছিলেন। কিন্তু, হায়, এই বিশ্রাম সুখ তাঁর ভাগ্যে ঈশ্বর বেশিদিন লেখেন নি।

তাঁর ব্রিস্টল-জীবনের একদিনের একটি।

এখানে আসবার এক সপ্তাহ পরে রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হয়ে স্টেপলটন গ্রোভে এসেছিলেন। ডাক্তার কার্পেন্টার, রেভারেণ্ড জন ফস্টার প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। রামমোহনের নাম তখন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সমাজে এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাঁকে একটিবার দেখবার জন্য লোকের মনে আগ্রহের সীমা-পরিসীমা ছিল না। উপস্থিত লোকদের সামনে তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ—এই নিয়ে আলোচনা করেন। পুরো তিনটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁর স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ উত্তরে সকলেই অভিভূত হলেন। সকলের হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে উঠল।

ইহজীবনে এটাই ছিল রামমোহনের শেষ কাজ!

প্রতিভার শেষ উদ্ভাসন—মনীষার অন্তিম দীপ্তি।

যে অসাধারণ প্রতিভা নানা রকম ভাষা ও সকল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে লোককে আশ্চর্য ও স্তব্ধ করে দিয়েছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে গঙ্গার তীরে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গের ওপর একমেবা-দ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিল, আজ ব্রিস্টল নগরে সমবেত পণ্ডিতগণ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কথা কুমারী কার্পেন্টার তাঁর বইতে লিখেছেন।

ব্রিস্টলে আসার পর প্রথম দুই রবিবার রামমোহন এখানকার গীর্জায় উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকবার সময় তিনি যখন একবার শ্রীরামপুরে কেরি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তখন কেরি তাঁকে ওয়াটসের লেখা ঈশ্বরভক্তিমূলক একটি গানের বই (ওয়াট্‌স হিমস্) উপহার দিয়েছিলেন। এটি শিশুদের বই। এই বইটি ব্রিস্টল পর্যন্ত রাজার সঙ্গে ছিল। এখানকার উপাসনা গৃহেও তিনি ঐ বই থেকে দু'একটা গান শিশুর মত সরল মনে আবৃত্তি করেছিলেন। এই ভগবৎ সংগীত তখন তাঁর হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

এটাই ছিল রামমোহনের শেষ উপাসনা।

কর্মময় জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল।

সমস্ত উত্তেজনা, উৎসাহ ও পরিশ্রমের শেষে তাঁকে যেন ক্লান্ত, অবসন্ন মনে হলো। ১৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সকালে তিনি জ্বরাক্রান্ত হলেন। ব্রিস্টলের শান্ত আকাশের নীলে ছুটির ইশারা জেগে উঠলো। অসুস্থ রামমোহন আর সুস্থ হলেন না। ডাক্তার এসে দেখলেন জ্বর হয়েছে। তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। হেয়ার সাহেবের ভাই ও বোন দুজনেই সেখানে

ছিলেন। পরের দিন রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হলো। মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছিল। সন্ধ্যায় তিনি একটু ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখের পাতা খোলা ছিল। রাত একটার সময় দেখা গেল তাঁর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

চিকিৎসক এসে নাড়ী দেখলেন। খুব দুর্বল—তার স্পন্দন ১৩০। গরম জল, একটু সুরা ও বাইরে থেকে হাতে-পায়ে গরম সেঁক দেওয়াতে কিছু উপকার হলো। কিন্তু রোগীর অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেলো। তিনি কখনো বিছানায়, কখনো সোফায়, কখনো বা মাটিতে শুতে লাগলেন। রামমোহনের অবস্থা দেখে সবাই উদ্বিগ্ন হলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর। ডাক্তার প্রিচার্ড এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি কিন্তু কোন আশা দিতে পারলেন না। মস্তিস্কের প্রদাহ। যে মস্তিস্ক স্বদেশের নানারকম সমস্যা ও বিশ্বমানবের কল্যাণ চিন্তায় সর্বক্ষণ আলোড়িত থাকত আজ তা-ই যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কুমারী হেয়ার অক্লান্তভাবে পরিচর্যা করে চলেছেন। রামমোহনকে তিনি পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করতেন। ২৩ তারিখে রোগী খুব অস্থিরতা বোধ করলেন। সারাদিন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। কাছে যে কেউ রয়েছে তা বুঝতে পারছেন না। আর একজন বড় ডাক্তারকে আনা হলো! সন্ধ্যায় প্রিচার্ডের সঙ্গে এলেন ডাক্তার ক্যারিক। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, মাথারই অসুখ। মাথায় জোঁক বসানো হলো। রামমোহন কিছু ভাল বোধ করলেন।

পরের দিন ঐ চিকিৎসক দুইজন—প্রিচার্ড ও ক্যারিক এলেন। দিনের বেলায় রামমোহন কিছুটা সুস্থ ছিলেন, ঘুমও হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় ও রাতে অবস্থা আবার খারাপ হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর শরীরে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখা গেল; তাঁর সমস্ত শরীর বেঁকে যেতে লাগল। চিকিৎসকরা এলেন। রামমোহনের চুল কেটে

তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া হলো। তাঁর চোখের তারা ছোট হয়ে এলো; বাঁ হাত ও পা মনে হোল অবশ হয়ে গেছে। তখন ডাক্তার বার্ণাডকে ডাকা স্থির হোল। কিন্তু রোগীর বিবরণ শুনে তিনি এলেন না। বিকেল বেলায় রামমোহনের সমস্ত শরীর যেন আগুনে পুড়ে যেতে লাগল। নাড়ী প্রবল হলেও সন্ধ্যা থেকে আবার শুরু হয় ধনুষ্টঙ্কার। তাঁর বাহ্যজ্ঞান প্রায় কিছুই ছিল না। প্রিচার্ড ও ক্যারিক চলে গেলেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে সকলেই উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। ১৮৩৩ সাল।

রামমোহনের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই খারাপ হয়ে এলো।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। নাড়ী চলছে কিনা বোঝা গেল না।

তখন সবাই বুঝলেন যে, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কারো কিছুই করার নেই। জানালার বাইরে জ্যোছ্‌নার আলো, নীল আকাশের শান্ত সুষমা, আর ভেতরে একজন অসাধারণ ব্যক্তি মহাপ্রস্থানের পথে। রাত দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় সাগর পারে সুদূর প্রবাসে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হলো। শয্যারপাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সকলেই শুনলেন, রোগীর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ধীরে উচ্চারিত হয়েছিল—ওঁ। এর থেকেই বোঝা যায় মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও ঈশ্বরের চিন্তাই তাঁর আত্মার প্রধান কাজ ছিল।

অপূর্ব চরিত্র,—অপূর্ব মৃত্যু!

রাজার মৃত্যু দৃশ্য মিস কলেট মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

'এইভাবে সেই মহান হিন্দুর আত্মা চলে গেল। বাল্যে পৈতৃক ধর্ম ও পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে, যৌবনে বিপুল সংগ্রামে লিপ্ত থেকে তিনি যেসব পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে জীবন যাপন করছিলেন, আজ তা চরম পরিবর্তনে পরিণত হলো। বিশ্রামহীন সাহসী সত্যান্বেষী

আজ তাঁর শান্তিময় গম্যস্থানে পৌঁছলেন। এই মহাপ্রস্থানের মধুর, কবিত্বপূর্ণ, করুণ দৃশ্য ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে ও স্মৃতিতে অনেককাল স্থায়ী হয়ে থাকবে। বাইরে—সেই আশ্চর্য সুদূর প্রতীচ্য দেশ, শরৎকালের চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় ঘুমিয়ে পড়েছে, দীপ্ত মনোরম পল্লী দৃশ্য, রূপোর মতো সাদা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত নির্জন উদ্যান গৃহ সবই শান্ত ও নিথর; প্রকৃতি ও রাত্রি দুজনে মিলে যেন অনন্ত নিস্তব্ধতাই ইঙ্গিত করছিল। ভেতরে—সেই মহান্ মুক্তিদাতা মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করবার চেষ্টা করছিলেন, আর যে শান্তি ও স্বাধীনতার আশা ও প্রতীক্ষায় জীবন পর্যন্ত দান করেছিলেন, তা-ই লাভ করছিলেন।'

এই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যটিই আজ আমাদের কাছে একটি পবিত্র স্মৃতিরূপে বর্তমান রয়েছে। এই ভাবেই সেদিন, সুদূর য়ুরোপে, দিগ্বিজয়ী তর্কযোদ্ধা, স্বদেশ-প্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ইংলণ্ডের গীর্জায় গীর্জায় সেদিন উপাসনা হয়েছিল।

রামমোহনের জীবন শেষ হলো।

আর তাঁর জীবনে জীবন লাভ করে জেগে উঠল সমস্ত ভারতবর্ষ।

জড়তা, অজ্ঞানতা, অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার—এরই হাজার রকমের বাঁধন থেকে মুক্ত করে ভারতকে তিনি স্থাপন করলেন আধুনিকতার রাজপথের ওপর। ভারতবাসীকে তিনি দিলেন মুক্ত স্বচ্ছ উদার স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার। দু'হাতে খুলে দিলেন তিনি তাদের উন্নতির সমস্ত অবরুদ্ধ পথ। বিশ্বের সামনে তিনি তুলে ধরলেন ভারতের শাশ্বত মহিমা। এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মানব-কল্যাণের মন্ত্র। পৃথিবীর সকল মানুষকে তিনি আহ্বান জানালেন বিশ্বমৈত্রীর বেদীমূলে। যে-আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে ধরায় এসেছিলেন রামমোহন, পৃথিবী আজ উদ্ভাসিত হয়েছে সে-আলোর পুণ্যপ্রভায়।

মানবগুরু রামমোহনকে প্রণাম।

প্রণাম আধুনিক ভারতের সেই স্রষ্টাকে যাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছিল নিখিল মানবের ঐক্য বাণী।

আজ যখন তোমরা রামমোহনের জীবনচরিত পাঠ করবে, তখন তাঁকে স্মরণ করবে আর বন্দনা করবে এই বলে ঃ

কর্মে ও জ্ঞানে, ধর্ম প্রচারে
স্বদেশ প্রেমেতে মাতালে ধরা ;
রাখিলে জগতে নূতন কীর্তি
ভুলিবার সে যে নহেক ত্বরা।
... ...

হে মহামানব কবি
তোমার জীবনছবি
অতুলন চরিত্র মহিমা
ব্যর্থ করি শতাব্দীর কালসীমা
আজিও রয়েছে সমুজ্বল
অভ্রভেদী অচল অটল !

———

রামমোহন বাণী

(১)

কি স্বদেশে, কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

(২)

মন যারে নাহি পায় নয়ন কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তার, কিরূপে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামত রাখে,
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।

(৩)

নিত্য নিরঞ্জন,   নিখিল কারণ
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকারবিহীন   কামক্রোধহীন,
নির্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর,   পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্বশক্তিমান   সর্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়   অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।

(৪)

স্বাধীনতার শক্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনদিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনদিন জয়ী হইবেও না।

(৫)

আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।

(৬)

যাহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই।

(৭)

বিশ্বজননীর উচ্চ বেদীই হইল আমার উপাসনার আসন। সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব, সকল ধর্মের উচ্চ চিন্তা ও আদর্শ আত্মস্থ করিয়া আমি এমন একটি উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব যেখানে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই এক ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিলিত হইতে পারেন।

(৮)

সকলের কল্যাণ করাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

(৯)

সকল অভাবের মূল হইল শিক্ষার অভাব। আলোক বিনা কোন কাজই অগ্রসর হয় না। শিক্ষাই হইল সে আলোক।

(১০)

বিশেষ বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নেতারা অথবা বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকরা অলৌকিকত্বের এমন ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন যে তাহারাই যেন ভক্তহৃদয়ে ছাড়পত্রের মালিক। ইহার ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস এইসব ধর্ম গুরুদের প্রতি বাড়িয়া যায়।

(১১)

সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরের বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মুলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দিয়া জয় করাই প্রকৃতির স্রষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহনীয় বিশুদ্ধ পূজা।

(১২)

লোকের অন্তরে শান্তি দাও, ইহাই একমাত্র পারমার্থিক উপদেশ।

(১৩)

যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেইস্থানে উপাসনা করিবে।

(১৪)

বিচার ও যুক্তি সহকারে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে।

(১৫)

ধর্ম যদি ঈশ্বরের হয়, রাজনীতি কি শয়তানের ?

(১৬)

বাংলার চাষীদের কথা ভাবিয়া সত্যিই আমার গভীর দুঃখ হয়। একদিকে জমিদারী প্রথার লোভ ও উচ্চাশা, আর একদিকে সরকারী রাজস্ব কর্মচারীদের শোষণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার তাহারা।

———

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৩১ তম

গ্রন্থ